রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর মুযেজা

খোশরোজ কিতাব মহল

মূল : হারুন ইয়াহিয়া, তুরস্ক
অনুবাদ : জাবীন হামিদ, বাংলাদেশ

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

প্রথম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

মুদ্রণে
মহীউদ্দীন আহমদ
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা - ১১০০

উৎসর্গ

কাজী শফিকুল আযম - কে

লেখক পরিচিতি

হারুন ইয়াহিয়া লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর জন্ম ১৯৫৬ সালে তুরস্কের আঙ্কারায়। তিনি ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান (Mimar Sinan) বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক বিভাগে ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৮০ সাল থেকে লেখক রাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক বই প্রকাশ করেন। লেখক বিপুল পরিচিতি লাভ করেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার জন্য যাতে তিনি উন্মোচন করেন বিবর্তনবাদের জালিয়াতি, বিবর্তনবাদীদের দাবির অসারতা, ডারউইনের মতবাদ ও রক্তাক্ত মতাদর্শের মধ্যে সম্পর্ক।

দু'জন বিখ্যাত নবী হযরত হারুন (আঃ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর নাম অনুসারে তিনি নিজের ছদ্মনাম বেছে নিয়েছেন। এই দুই নবী ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর ব্যবহৃত সীলমোহর লেখকের সব বইয়ের প্রচ্ছদে দেয়া হয়। কুরআন যে স্রষ্টার শেষ আসমানী কিতাব ও সর্বশেষ বাণী এবং হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) সকল নবী ও রাসূলদের শেষ - এসব বুঝাতে সীলমোহরটি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লেখকের প্রধান লক্ষ্য হলো, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সব ধরনের ধর্মহীন মতবাদকে ভুল প্রমাণ করা ও "শেষ কথা" বলা। এর মাধ্যমে ধর্মের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়, তার সমাপ্তি ঘটানো। রাসূল (দঃ) যিনি ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন ও উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন, তাঁর ব্যবহৃত সীলমোহর "শেষ কথার" প্রতীক।

[অনুবাদকের সংযোজন ঃ সীলমোহরে খোদাই করা আছে "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (দঃ)।"]

লেখকের উদ্দেশ্য একটি লক্ষ্যকে ঘিরে তা হচ্ছে, কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। এভাবে তিনি মানুষকে ধর্ম, ধর্মের মূল বিষয়গুলি যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, পরকাল ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে উৎসাহ দেন।

এছাড়াও, ধর্মীয় আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথাও তিনি পাঠকদের মনে করিয়ে দেন। এই লেখকের লেখা বিভিন্ন দেশের পাঠকের কাছে জনপ্রিয়। যেমন- ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, বসনিয়া, স্পেন ও ব্রাজিল। লেখকের প্রকাশনা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যেমন, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, পর্তুগিজ, উর্দু, আরবী, আলবেনিয়ান, রুশ, সার্বোক্রোট (বসনিয়ান), ইউগুর টার্কিস (Uygur Turkish) ও ইন্দোনেশিয়ান। হারুন ইয়াহিয়ার কাজ সারা বিশ্বে বিপুলভাবে প্রশংসিত। এর মধ্য দিয়ে অনেক মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস এনেছে ; অনেক মানুষ ধর্মকে আরো গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে।

লেখকের লেখায় যে জ্ঞান, একনিষ্ঠতা, সহজ-সরল আবেদন প্রকাশ পায়, তা তাঁর বইকে দিয়েছে বিশেষত্ব। বই পড়া বা লেখকের যুক্তি পর্যালোচনা করার সময় পাঠকের মনকে এটি নাড়া দেয়।

লেখকের বইগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, ধর্মের বিরুদ্ধে সব অভিযোগের যথার্থ উত্তর এতে রয়েছে। এর প্রভাব দ্রুত পড়ে পাঠকের উপর ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে লেখকের জবাবগুলি চমৎকার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে বা প্রতিরোধ করা যায় না। বিভিন্ন ব্যাখ্যা যা লেখক তাঁর বইতে দিয়েছেন সেসব অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর যুক্তি-তর্কগুলি চমৎকার ও পাঠককে যথার্থ উত্তর দিয়ে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে। কোন পাঠক এই বইগুলি পড়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তিনি আর ভোগবাদী দর্শন, নাস্তিকতা বা অন্য কোন বিকৃত মত বা আদর্শের সমর্থক থাকবেন এমনটি ভাবা যায় না। যদি কেউ এমন করে তবে তা নেহাতই আবেগপ্রসূত। কেননা, এই বইগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে ধর্মহীন মতবাদগুলির মূল বিষয়গুলি প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে।

ধর্মহীন বিভিন্ন মত ও তার পক্ষের আন্দোলন আজ পরাজিত হচ্ছে – ধন্যবাদ হারুন ইয়াহিয়াকে তাঁর বিভিন্ন প্রকাশনার জন্য। নিঃসন্দেহে এই প্রকাশনা যা জ্ঞান ও স্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ আল্লাহর'ই দান। লেখক এ নিয়ে অহংকার করেন না। যারা স্রষ্টাকে পেতে চায়, তিনি চান তাদেরকে সাহায্য করতে। লেখক বই থেকে কোন লাভ নেন না। শুধু লেখক নন, বই প্রকাশনায় যারা তাঁর সাথে যুক্ত তারাও এই বই থেকে জাগতিক কোন লাভ চান না - চান শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তাই যারা অন্যকে এ সব বই পড়তে উৎসাহ দেবেন, যা তাদের বদ্ধ মনের চোখকে খুলে দেবে ও আল্লাহর বিনীত বান্দা হতে পথ দেখাবে, তারাও প্রশংসনীয় কাজ করবেন। যে বই মানুষের মনে দ্বিধা- দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, মানুষকে

বিভ্রান্তিমূলক মতবাদগুলির জটিলতার মধ্যে ঠেলে দেয়, যা মানুষের মনের সন্দেহ দূর করতে কোন প্রভাব ফেলে না, সেই বই লেখা মানে টাকা, সময় ও শক্তির অপচয়। মানুষকে ধর্মহীনতার প্রভাব থেকে রক্ষা করতে লেখকের দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। জরুরী হলো মানুষকে রক্ষার মহৎ মনোভাব। হারুন ইয়াহিয়ার বইগুলির লক্ষ্য হলো ধর্মহীনতা থেকে মানুষকে বাঁচানো ও কুরআনের আদর্শ সবাইকে জানানো। এই আন্তরিক প্রচেষ্টার সাফল্য বোঝা যায় পাঠকের উপর এর প্রভাব থেকে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে ঃ মুসলমানরা এখন যে নির্মমতা, সংঘর্ষ ও অন্যান্য কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ ধর্মহীনতা ও ধর্মহীন মতবাদের ব্যাপক প্রসার। এসব নির্মমতার শেষ তখনই হবে যখন ধর্মহীনতার অবসান হবে। এজন্য মানুষকে প্রকৃত ধর্ম, স্রষ্টা ও স্রষ্টার চমৎকার সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে হবে কুরআনের আদর্শ ও নীতিমালা মানুষকে জানাতে হবে যেন মানুষ তা মেনে চলে। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখি মানুষ সন্ত্রাস, যুদ্ধ, দুর্নীতির পঙ্কিল চক্রে জড়িয়ে পড়ছে। তাই মানুষকে বাঁচানোর জন্য যা করার তা ফলপ্রসূভাবে এখনই করতে হবে। নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এটা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে মানুষকে স্রষ্টা সম্পর্কে জানানোর ক্ষেত্রে হারুন ইয়াহিয়ার প্রকাশনা মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে। ইনশআল্লাহ এর মধ্য দিয়ে আল্লাহকে জানার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ স্রষ্টার প্রতিশ্রুত শান্তি, রহমত, ন্যায়বিচার ও সুখের সন্ধান পাবে। এই লেখকের আরো কিছু বই হলো ঃ The Disasters Darwinism Brought to Humanity, Communism in Ambush, The 'Secret Hand' in Bosnia, The Holocaust Hoax, Behind the Scenes of Terrorism, Israel's Kurdish Card, Solution: The Morals of the Qur'an, The Evolution Deceit, Perished Nations, For men of Understanding, The Prophet Musa, The Golden Age, Allah's Artistry in Colour, Glory is Everywhere, The Truth of the Life of This World, Knowing the Truth, The Dark Magic of Darwinism, The Religion of Darwinism, The Qur'an Leads the Way to Science, The Real Origin of Life, The Consciousness of the Cell, The Creation of the Universe, Miracles of the Qur'an, The Design in Nature, Self-sacrifice and Intelligent Behaviour Models in Animals, Children Darwin Was Lying!! The End of Darwinism, Deep Thinking, Never Plead Ignorance.

কুরআনের উপর লেখকের আরো কিছু কাজের তালিকা নিচে দেয়া হলো : Devoted to Allah, Abandoning the Society of Ignorance, Paradise, Knowledge of the Qur'an, Quran Index, Emigrating for the Cause of Allah, The Character of Hypocrites in the Qur'an, The Secrets of the Hypocrite, the Names of Allah, Communicating the Message and Disputing in the Qur'an, Answers from the Qur'an, Death Resurrection Hell, The Struggle of the Messengers, The Avowed Enemy of Man: Satan, Idolatry, The Religion of the Ignorant, The Arrogance of Satan, Prayer in the Qur'an, The Importance of Conscience in the Qur'an, The Day of Resurrection, Never Forget, Disregarded Judgements of the Qur'an, Human Characters in the Society of Ignorance, The Importance of Patience in the Qur'an, General Information from the Qur'an, The Mature Faith, Before You Regret, Our Messengers Say, The Mercy of Believers, The Fear of Allah, The Nightmare of Disbelief, Prophet Isa Will Come, Beauties Presented by the Qur'an for Life, Bouquet of the Beauties of Allah 1-2-3-4, The Iniquity Called "Mockery", The Secret of the Test, The True Wisdom According to the Qur'an, The Struggle with the Religion of Irreligion, The School of Yusuf, The Alliance of the Good, Slanders Spread Against Muslims Throughout History, The Importance of Following the Good Word, Why Do You Deceive Yourself ?, Islam : The Religion of Ease, Enthusiasm and Vigor in the Qur'an, Seeing Good in Everything, How does the Unwise Interpret the Qur'an ? Some Secrets of the Qur'an, The Courage of Believers, Being Hopeful in the Qur'an, Justice and Tolerance in the Qur'an.

অনুবাদের ব্যাপারে কোন পরামর্শ থাকলে ই-মেলে জানাতে অনুরোধ করছি। যাজাক আল্লাহু খায়রান (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন)।

জাবীন হামিদ
jabin.hamid @gmail.com

সূচি

১. ভূমিকা

মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে, মানুষ যেন এই দুনিয়ায় ও মৃত্যুর পরের জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ যুগে যুগে সকল জাতির কাছে নবী পাঠিয়েছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য এটা আল্লাহ'র তরফ থেকে অসীম দয়া ঃ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যে আল্লাহ'র আয়াত তাঁদের কাছে তিলাওয়াত করে, তাদেরকে শুদ্ধ করে ও পবিত্র কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় : যদিও তারা ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে"। *[সূরা ইমরান ; ৩ ঃ ১৬৪]*

আল্লাহ তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-কে বলেন ; "আমি তোমাকে পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসাবে পাঠিয়েছি।" *[সূরা আম্বিয়া : ২১ ঃ ১০৭]*

এই সকল নবী ও রাসূল (দঃ) নিজ নিজ জাতিকে সত্যের আলো দেখাতেন ; তাঁরা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান ও আল্লাহ'র নির্দেশ জানাতেন। দুনিয়ার পরবর্তী জীবনের জন্য নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ'র একত্ববাদ ও তাঁর হুকুম মেনে চলার গুরুত্ব সবার কাছে পৌঁছে দিতেন। আল্লাহ'র তরফ থেকে আসা এই নবীদের আগমনের উপকারিতা খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছিল।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "............. বেশিরভাগ মানুষই ঈমান আনলো না" (সূরা রাদ : ১৩ ঃ ১)। "তুমি যতই চাও না কেন, বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাসী নয়"। *[সূরা ইউসুফ ; ১২ ঃ ১০৩]*

নবীদের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ'র বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া। তাঁরা মানুষের কাছ থেকে কোন টাকা-পয়সা বা জাগতিক লাভ চাইতেন না। আল্লাহ'র সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের কাম্য। তাঁরা ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও প্রকৃত আল্লাহভীরু।

আল্লাহ'র পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে জাগতিক কোন লাভ তো তাঁদের হয়-ই নি বরং নানা ধরনের বিপদ-আপদের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। এসব বিপদ তাঁদের ঈমানকে আরো মজবুত করেছে।

নবীদের এই আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা, দৃঢ়চিত্ততা, আন্তরিকতা ও আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাসের প্রতিদানে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। কুরআনে বলা আছে, "এটা আল্লাহ'র সিদ্ধান্ত ঃ আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো ও আমার রাসূলরাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।"

[সূরা মুজদালাহ : ৫৮ ঃ ২১]

আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর তাঁর রহমত বাড়িয়ে দেন ও বিপদ মুক্তির উপায় করে দেন। কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁদের সাহস ও শক্তি বাড়ান, তাঁদের বোঝা হালকা করে দেন ও আল্লাহ'র ক্ষমা ও রহমতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁদের মনোবল দৃঢ় করেন।

নবী ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ যেভাবে সাহায্য ও রক্ষা করেন, তা কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে – "নিশ্চয়ই আমি রাসূলদের ও মু'মিনদের সাহায্য করবো এই দুনিয়ায় ও সেদিন যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে)"।

[সূরা মু'মিন/গাফির : ৪০ ঃ ৫১]

আল্লাহ কিছু রাসূলকে অলৌকিক কাজ করার শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন। অলৌকিকত্ব বা মুযেজা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ'র এক চ্যালেঞ্জ। এটা এমন এক ব্যাপার যা মানুষ নিজের শক্তিতে করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ'র ইচ্ছাতেই হতে পারে।

মুযেজা হলো, এমন এক অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ব্যাপার যা মানুষের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। এর দুই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১। যারা বিশ্বাসী তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়,

২। অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনে।

যারা মুযেজায় বিশ্বাস করতো না, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয় একই ধরনের কিছু করে দেখাতে। যখন তারা তা পারলো না, তখন আল্লাহ'র কালামে তা প্রকাশিত হয় ও অবিশ্বাসীদের ব্যর্থতা উন্মোচিত হয়।

আল্লাহ যে মুযেজা রাসূলদের দান করেছিলেন

নবী ও রাসূলদের জীবনের অনেক ঘটনা বিস্তারিতভাবে কুরআনে বলা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন মুযেজা যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেছেন, তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ও অবিশ্বাসীদের থেকে মুযেজার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

মুযেজাপ্রাপ্ত নবী ও রাসূলদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (দঃ)।

মুযেজার বর্ণনা

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মুযেজা

যে আগুনে ইবরাহীম (আঃ)-কে ছুঁড়ে ফেলা হয়, সেই আগুন তাঁকে না পুড়িয়ে বরং শীতল হয়ে গিয়েছিল।

মূর্তি পূজারীরা ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর খুবই রেগে গিয়েছিল ; কারণ, তিনি মূর্তিদের সমালোচনা করতেন। সেজন্য মূর্তি উপাসকরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে আগুনে ফেলে দেয়। কিন্তু আল্লাহ মুযেজার মাধ্যমে তার এই নবীকে রক্ষা করেন। কুরআনে আল্লাহ জানান, তাঁরই আদেশে আগুন ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন ক্ষতি করেনি – "আমি বললাম ঃ যে আগুন ; তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও"। *[সূরা আম্বিয়া : ২১ ঃ ৬৯]*

যে পাখিকে ইবরাহীম (আঃ) কেটে টুকরো টুকরো করেন, সেই পাখি তাঁর কাছে জীবিত ফেরত আসলো ঃ "যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না ? ইবরাহীম বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে দেখতে চাচ্ছি মনের প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ বললেন ঃ তবে চারটি পাখি ধরে পোষ মানাও। তারপর তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে রাখো। এরপর ওদের ডাকো ; তারা দ্রুত তোমার কাছে চলে আসবে।" *[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ২৬০]*

হযরত মুসা (আঃ)-এর মুযেজা

আল্লাহ যে মুযেজা মুসা (আঃ)-কে দান করেছিলেন, তা তিনি ব্যবহার করেছিলেন ফেরাউন ও তার পরিষদকে সত্য পথের দাওয়াত দিতে ...... "ফেরাউন বললো, যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাকো, তবে সত্যবাদী হলে তা দেখাও। তখন মুসা তার লাঠি ছুঁড়ে দিলো ও সাথে সাথে তা অজগর হলো"।

[সূরা আরাফ ; ৭ ঃ ১০৬-১০৭]

মুসা (আঃ)-এর লাঠি পরিণত হয় বিশাল এক সাপে (অজগরে) ও জাদুকরদের সব সাপকে তা গিলে খায়... "তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো ; এটা ওরা যা করেছে সেটাকে খেয়ে ফেলবে। ওরা যা করেছে

তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল ; জাদুকররা যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।"
[সূরা ত্বাহা : ২০ ঃ ৬৯]

মুসা (আঃ)-এর হাত বরফের মতো সাদা হতো – "তোমার হাত বগলে ঢুকিয়ে চাপ দাও। এটা সম্পূর্ণ সাদা বের হয়ে আসবে যা একটি নিদর্শন। এভাবে আমি তোমাকে আমার সেরা কিছু নিদর্শন দেখাবো।"
[সূরা ত্বাহা ; ২০ ঃ ২২-২৩]

ফেরাউনের কাছ থেকে মুসা (আঃ) ও বনী ইসরাইলরা পালিয়ে যান। মুযেজার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে অক্ষতভাবে পালাতে সাহায্য করেন। অন্যদিকে ফেরাউন দলবলসহ ডুবে যায় পানিতে।

মুসা (আঃ) লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন ও সমুদ্রের মধ্যে তাঁর জন্য পথ বের হয় ঃ "যখন দুই দল একে অন্যকে দেখলো, তখন মুসার সাথীরা বললো, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা বললো ঃ কখনো না। আমার সাথে আমার প্রভু আছেন ; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম ঃ তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে উঁচু পাহাড়ের মত হয়ে গেল। আমি অন্য দলকে সেখানে আনলাম ও উদ্ধার করলাম মুসা ও তাঁর সাথীদের এবং পানিতে ডুবিয়ে দিলাম বিরোধী অন্য দলকে। *[সূরা শু'আরা ; ২৬ ঃ ৬১-৬৬]*

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মুযেজা

মাছ গিলে ফেলার পর অলৌকিকভাবে ইউনুস (আঃ) রক্ষা পান – "ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গেল ও লটারীতে দোষী সাব্যস্ত হলো, এরপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে ও সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। সে যদি আল্লাহ'র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতো, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে মাছের পেটেই থাকতে হতো ; তারপর আমি ওকে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে, সে ছিল তখন রুগ্ন।"
[সূরা সাফফাত : ৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৫]

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর মুযেজা

অতি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সুখবর পান তিনি – "... যাকারিয়া তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন ঃ হে আমার প্রভু! আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে

সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শুনে থাকো। যখন যাকারিয়া সালাতে দাঁড়ালেন, তখন ফিরিশতা তাকে ডেকে বললো ঃ আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুখবর দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহ'র বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী ও পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।" *[সূরা ইমরান ; ৩ ঃ ৩৮-৪০]*

মারইয়াম (আঃ)-কে যে মুযেজা দান করা হয়েছিল

সবসময়ই তাঁর কাছে খাবার থাকতো – "... যখনই যাকারিয়া কামরায় মারইয়ামের সাথে দেখা করতে যেতেন, তখনই তার কাছে খাবার দেখতেন ; যাকারিয়া বলতেন ঃ হে মারইয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে ? সে বলতো ঃ এসব আল্লাহ'র কাছ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।" *[সূরা ইমরান ; ৩ ঃ ৩৭]*

ঈসা (আঃ)-এর মুযেজা

জন্ম মুহূর্ত থেকে শুরু করে সারা জীবন ধরেই ঈসা (আঃ)-কে মুযেজা দান করা হয়। এসবের বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে দেয়া হয়েছে। "যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো। পবিত্র আত্মা দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে মায়ের কোলেও এবং পরিণত বয়সেও। আর আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইনজিল।

তুমি কাদামাটি দিয়ে আমার আদেশে পাখি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিতে ; আর আমার আদেশে তা পাখি হয়ে যেত। আমার আদেশে তুমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে।

তুমি, আমার আদেশে মৃতকে (কবর থেকে) বের করে নিয়ে আসতে ; আমি বনী ইসরাইলকে নিবৃত্ত করেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে গিয়েছিলে আর তাদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা বলেছিল ঃ এ তো জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। *[সূরা মায়িদা ; ৫ ঃ ১১০]*

"আর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (ঈসাকে) শিখালেন কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইনজিল ; ও তাঁকে বনী ইসরাইলের জন্য রাসূল হিসাবে মনোনীত করবেন।

তিনি বলবেন ; আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে। তা এই, আমি কাদামাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে ফুঁ দিবো।

এরপর আল্লাহ'র হুকুমে তা জীবন্ত পাখি হয়ে যাবে। আমি আল্লাহ'র আদেশে ভাল করে তুলবো জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগীকে ও মৃতকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমি তোমাদের বলে দেব তোমরা কী খাও ও কী ঘরে মজুদ রেখেছো।

নিশ্চয়ই এসব হলো নিদর্শন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও"।

[সূরা ইমরান : ৩ ঃ ৪৮-৪৯]

উপরে উল্লিখিত মুযেজা ছাড়াও আরো বেশ কিছু মুযেজার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। এসব মুযেজাই আল্লাহ'র আদেশে এবং তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আমি তোমার [মুহাম্মাদ (দঃ)]-এর আগে অনেক নবী, রাসূল পাঠিয়েছি ও তাঁদেরকে স্ত্রী, সন্তান দিয়েছি ; কোন রাসূলেরই এই ক্ষমতা ছিল না যে আল্লাহ'র আদেশ ছাড়া কোন আয়াত হাজির করবে। নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বিধি রয়েছে।" *[সূরা রাদ ; ১৩ ঃ ৩৮]*

হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) ছিলেন একজন বরকতময় মানুষ। তাঁর সব কথা, কাজ, দৃঢ় ঈমান ও সৎ স্বভাব এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ পুরো মানবজাতির জন্য রাসূল (দঃ)-কে উত্তম আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আগের অনেক নবী ও রাসূলদের মতো হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) ও আল্লাহর অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু মুযেজা দেখান – যেন মানুষ মুযেজা থেকে শিখতে পারে। কিছু মুযেজা শুধুমাত্র রাসূল (দঃ)-এর সাথীরাই দেখেছেন, অন্য মুযেজা অবিশ্বাসীরাও অনেকেই দেখেছে।

এ ধরনের কিছু মুযেজার কথা কুরআনে এসেছে। অন্যগুলির কথা হাদীস ও ইসলামী চিন্তাবিদদের বর্ণনায় আছে। এ সব তথ্য থেকে আল্লাহ'র অনুগ্রহ প্রাপ্ত রাসূল (দঃ)– যিনি বিশ্বাসীদের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন – তাঁর বিভিন্ন মুযেজার কথা জানা যায়। এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব সম্পর্কেও আমরা বুঝতে পারি।

২. নবী হওয়ার আগেই হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-কে আল্লাহ যে মুযেজা দান করেছিলেন

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল (দঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তবে ওহী লাভের আগেই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা ভবিষ্যতে তাঁর নবী হওয়ার ইশারা দেয়।

রাসূল (দঃ)-এর জন্মের সময় দাই-মা ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফের মা আশ-শিফা। তিনি বলেন, রাসূল (দঃ) যখন তার হাতে জন্মান ও হাঁচি দেন, তখন তিনি স্পষ্ট শুনতে পান কেউ একজন বলছে, আপনার উপর আল্লাহ'র রহমত বর্ষিত হোক। তিনি আরো বলেন, পুরো পৃথিবী যেন আলোকময় হয়ে গিয়েছিল (আবু নায়ীম)।

রাসূল (দঃ) যখন পথ চলতেন, তখন সবসময় তাঁর উপর ছায়া থাকতো। রাসূল (দঃ)-এর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা (রাঃ) বলেন, তিনি দেখেছিলেন দু'জন ফিরিশতা তাঁর স্বামীকে পথ চলার সময় ঢেকে রেখেছিলেন (ইবনে সাদ)।

রাসূল (দঃ)-এর দাই – মা বনী সাদ ইবনে বাকর গোত্রের বিবি হালিমা বলেন, নবী (দঃ) যখন তার সাথে ছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন মেঘ তাঁকে সবসময় ছায়া দিতো।

এক সফরে রাসূল (দঃ) বিশ্রাম নেয়ার জন্য এক শুকনো গাছের নিচে বসেন। গাছটি সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে ও প্রচলিত বর্ণনা মতে গাছের ছায়া বেড়ে গিয়ে রাসূল (দঃ)-কে ঢেকে রাখে। গাছটির আশেপাশের গাছগুলি সতেজ, সবুজ হয়ে উঠে।

নবী হওয়ার সময় যখন কাছেই, তখন হযরত (দঃ) স্বপ্নে যা দেখতেন, তা-ই সত্য হতো। হাদীস থেকে জানা যায়, প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত হযরত (দঃ) এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল বুখারী এসব স্বপ্নের বিবরণ তার বইতে দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ওহী নাজিল হওয়ার সময় যখন এসেছিল তখন হযরত (দঃ) সবসময়ই স্বপ্নে যা দেখতেন তা সত্য হতো। এমনটি কখনো হয়নি যে তিনি ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নে যা দেখেছেন তা ঘটেনি। (বুখারী)

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে হযরত (দঃ)-এর এ ধরনের স্বপ্ন দেখার কারণ হলো রাসূল হওয়ার গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো।

৩. অলৌকিক ওহী

হযরত (দঃ)-কে আল্লাহ'র তরফ থেকে যেসব মুযেজা দান করা হয়, নিঃসন্দেহে সে সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন।

আল্লাহ মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য হযরত (দঃ)-কে নির্বাচিত করেন। এটি ছিল এক বিরাট দায়িত্ব যে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে

– "হে চাদরে ঢাকা রাসূল! রাতে নামাজ পড়ো – কিছু সময় বাদ দিয়ে – রাতের অর্ধেক বা এর কিছু কম বা বেশি ; কুরআন তেলাওয়াত করো স্পষ্টভাবে। আমি তোমার কাছে পাঠাবো গুরুত্বপূর্ণ বাণী ; রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠার জোরালো প্রভাব রয়েছে – তা মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। দিনের বেলা তোমার অনেক কাজ থাকে। তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করো।" *[সূরা মুজাম্মেল ; ৭৩ ঃ ১-৮]*

ওহী ঃ স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ঘটনা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওহী নাজিল হলো। স্বপ্ন দেখার পর থেকে হযরত (দঃ) জাবল-এ-নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় গিয়ে নিয়মিত ধ্যান করা শুরু করলেন।

এই পাহাড়টি মক্কা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে। এক রমজান মাসে হযরত (দঃ) যখন গুহায় একা, তখন জিবরাইল (আঃ) তাঁকে দেখা দিয়ে আল্লাহ'র আদেশ শোনালেন - পড়ো। হযরত (দঃ)-এর বয়স তখন ৪০।

এই ঘটনাগুলি হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে

আয়শা (রাঃ) বলেন, ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন দেখা শুরুর পরেই ওহী নাজিল হয়। হযরত (দঃ) হেরা গুহায় গিয়ে রাতের পর রাত আল্লাহ'র ধ্যান করতেন। তিনি কিছু খাবার সাথে করে নিয়ে যেতেন। সেগুলি ফুরিয়ে গেলে তিনি বাড়ি ফিরে বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর কাছ থেকে আবারো কিছু খাবার নিয়ে গুহায় ফিরে যেতেন। [অনুবাদকের সংযোজন ঃ কখনো খাদিজা (রা) নিজেও পাহাড়ে গিয়ে স্বামীকে খাবার দিয়ে আসতেন।]

এমনই এক সময়ে হেরা গুহায় হঠাৎ করে সত্যের বাণী তাঁর উপর নাজিল হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে পড়তে বললেন। হযরত (দঃ) জানালেন – আমি পড়তে পারি না।

হযরত (দঃ) পরে বললেন, তখন ফিরিশতা আমাকে ধরে সজোরে চাপ দেন। যখন সেই চাপ আর সহ্য হচ্ছিলো না, তখন ফিরিশতা ছেড়ে দিয়ে আবারো পড়তে বললেন। আমি আবারো বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। ফিরিশতা তখন আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। যখন আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, তখন ফিরিশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবারো পড়তে বললেন। আমি আবারো বললাম, আমি পড়তে পারি না অথবা আমি কী পড়বো ?

তখন ফিরিশতা তৃতীয়বারের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিয়ে [কুরআনের আয়াত শোনালেন ঃ বললেন ঃ পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন ; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে ; পাঠ করো আর তোমার রব খুবই দয়ালু, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না ...। *[সূরা আলাক ; ৯৬ ঃ ১-৫]*

এরপর আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) ওহী নিয়ে ফিরে আসলেন (বুখারী)।

নবীর (দঃ)-এর কাছে ওহী নাজিল ও জিবরাইল (আঃ)-এর সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা কুরআনের একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন, "... তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী নয় ; সে খেয়াল খুশিমতো কথা বলে না। এ কুরআন ওহী ছাড়া আর কিছুই নয় যা তাঁকে শেখায় এক শক্তিশালী সত্ত্বা। সে (ফিরিশতা) স্থির হয়েছিলো, সর্বোচ্চ দিগন্তে-এরপর ফিরিশতা কাছে আসলো ; তাদের [মুহাম্মাদ (দঃ) ও জিবরাইল (আঃ)-এর মধ্যে] দূরত্ব ছিল দুই ধনুকের ব্যবধান বা তার চেয়েও কম। তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন।

"সে যা দেখেছে তাঁর হৃদয় সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি। তবে কি তোমরা সে যা দেখেছে তা নিয়ে তাঁর সাথে তর্ক করবে ?" *[সূরা নাজম ; ৫৩ ঃ ২-১২]*

কুরআনের ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে কারো কারো মতে এই আয়াতগুলিতে ওহী নাজিলের কথা বলা হয়েছে। আবার কারো মতে, এটা শবেমেরাজে আল্লাহ'র সাথে রাসূল (দঃ)-এর দেখা হওয়ার ঘটনা।

আরো কিছু আয়াত আছে যাতে এই সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায় যে জিবরাইল (আঃ) আল্লাহ'র তরফ থেকে কুরআন নবীর (দঃ) কাছে নিয়ে আসেন। এসব আয়াতে জিবরাইল (আঃ)-কে বলা হয়েছে পবিত্র বা বিশ্বাসী আত্মা ঃ "তুমি বলে দাও ঃ যে কেউ জিবরাইলের শত্রু – এজন্য যে, সে আল্লাহ'র আদেশে তোমার অন্তরে কুরআন নাজিল করে, যা আগেকার কিতাবের সত্যতার সমর্থক ও মু'মিনদের জন্য পথ–প্রদর্শক ও সুসংবাদ দানকারী ... (সূরা বাকারা ; ২ ঃ ৯৭ ;)। "বলো ঃ পবিত্র আত্মা তোমার রবের কাছ থেকে সত্যসহ কুরআন নিয়ে আসে ; যারা মু'মিন তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য ও মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও সুসংবাদ হিসাবে"। *[সূরা নাহল ; ১৬ ঃ ১০২]*

"সত্যিই এই ওহী আসে জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে। বিশ্বাসী আত্মা এটা নিয়ে আসে তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের একজন হতে পারো"। *[সূরা শুয়ারা ; ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪]*

সূরা শুয়ারার আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কুরআন নাজিল হয়েছে হযরত (দঃ)-এর অন্তরে। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ'র রহমত। কুরআনে আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন ঃ "কিন্তু (আমি এ ওহী তোমার অন্তরে রেখেছি ও তোমার কাছ থেকে তা যে নিয়ে নেয়া হয়নি)–এটা তোমার প্রভুর দয়া। আল্লাহ'র অসীম রহমত তোমার উপর রয়েছে।" *[সূরা ইসরা/বনী ইসরাইল ; ১৭ ঃ ৮৭]*

তুমি এটা আশা করোনি যে তোমার উপর এ কিতাব অবতীর্ণ হবে ; এ তো কেবল তোমার প্রভুর অনুগ্রহ .. । *[সূরা কাসাস ; ২৮ ঃ ৮৬]*

বলা হয় যে, প্রথম ওহীর পরে বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ওহী আসা বন্ধ ছিল। হাদীসে বলা হয়েছে, এরপর যখন আবার ওহী আসা শুরু হয় তখন সূরা আল মুদাসসিরের প্রথম তিনটি আয়াত অবতীর্ন হয় ... "হে কাপড়ে ঢাকা রাসূল! ওঠো, সতর্ক করো। তোমার প্রভুর প্রশংসা করো"। *[সূরা মুদাসসির ; ৭৪ ঃ ১-৩]*

কুরআনের এসব আয়াত আসার পর আল্লাহ'র আদেশ হযরত (দঃ) মেনে নিলেন ও মানুষের কাছে আল্লাহ'র বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব শুরু করলেন।

এরপর একনাগাড়ে ২৩ বছর ধরে ওহী আসলো হযরত (দঃ)-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

ওহী গ্রহণের সময় হযরত (দঃ)-এর অবস্থা

ওহী যখন আসতো, তখন নবীর (দঃ) অনুভূতি কেমন হতো তা হাদীসে বলা হয়েছে।

ওহী গ্রহণের সময় উপস্থিত সাহাবীরা বলেছেন, তারা মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মতো শব্দ শুনতে পেতেন। কিছু সূত্রে জানা যায়, নবীর (দঃ) মুখের চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির মতো শব্দ হতো।

বেশ কিছু হাদীসে নবীর (দঃ) শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আয়শা (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ)-এর কাছে আল হারিথ ইবনে হিশাম জানতে চান – ওহী কিভাবে আপনার কাছে আসে ?

রাসূল (দঃ) বলেন, ফিরিশতা যখন আমার কাছে আসেন, তখন কখনো আমি এমন কন্ঠস্বর শুনি যা অনেকটা ঘন্টাধ্বনির মতো। এই অবস্থা যখন শেষ হয়, তখন আমি মনে করতে পারি ফিরিশতা কী বলেছিলেন। এই ধরনের ওহী নাজিল আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন বোধ হতো।

কখনো ফিরিশতা মানুষের রূপ ধরে এসে কথা বলতেন। আমি তা বুঝতে ও মনে রাখতে পারতাম (আল বুখারী)।

আয়শা (রাঃ) বলেন, এক শীতের দিনে আমি দেখেছি রাসূল (দঃ) ওহী গ্রহণ করছেন আর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে (বুখারী ও তিরমিজী)।

যায়েদ ইবনে সাবিত বলেন ঃ আমি ওহী লিখতাম। যখন ওহী আসতো – রাসূল (দঃ) বেশ অবসন্ন হয়ে পড়তেন ; তখন মুক্তার মতো ঘাম বের হতো। ওহী গ্রহণ শেষ হলে তিনি তা তেলাওয়াত করতেন আর আমি লিখতাম (তাবারানী – দ্রষ্টব্য টীকা ১)

আবু হুরায়রা বলেন, যখন আল্লাহ'র কাছ থেকে ওহী আসতো, তখন রাসূল (দঃ)-এর অবস্থা জ্ঞান হারানোর মতো হতো (আবু নায়ীম– টীকা ২)।

রাসূল (দঃ)-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে কুরআনকে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল

কুরআন নাজিল হয় রাসূল (দঃ)-এর হৃদয়ের গভীরে – ২৩ বছর ধরে আল্লাহ রাসূল (দঃ)-এর উপর কুরআন নাজিল করেন। কুরআন রাসূল (দঃ)-এর অন্তরকে মজবুত করে তোলে – "কাফিররা বলে, পুরো কুরআন তাঁর কাছে একবারে কেন নাজিল করা হলো না ? আমি এটা এজন্য এভাবে নাজিল করেছি যাতে তোমার অন্তর দৃঢ় হয় ও এজন্যই আমি (আল্লাহ'র পক্ষ থেকে জিবরাইল) ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তোমার কাছে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করি।

[সূরা ফুরকান ; ২৫ ঃ ৩২]

ওহী নাজিল হওয়ার পুরোটা সময় জুড়েই আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ)-কে সমর্থন জুগিয়েছেন ও মানুষের কাছে সঠিকভাবে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন।

কিভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ)-কে উপদেশ দিয়েছেন – "মুখস্থ করার জন্য তুমি ওহী নাজিলের সময় তাড়াতড়ি জিহ্বা নাড়বে না ; এর সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ; তাই যখন এটি তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা অনুসরণ করো ; এরপরে এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার।" *[সূরা কিয়ামাহ ; ৭৫ ঃ ১৬-১৯]*

আল্লাহ অতি মর্যাদাবান, প্রকৃত অধীশ্বর, তিনি সত্য। তোমার কাছে ওহী নাজিল শেষ হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করো না ও বলো ঃ হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। [সূরা ত্বাহা ; ২০ ঃ ১১৪]

আল্লাহ রাসূলকে সাহায্য করেছেন কুরআনের আয়াত স্মৃতিতে ধরে রাখতে – "আমি তোমাকে পাঠ করাবো, তাই তুমি কুরআন ভুলবে না ।"

[সূরা আ'লা ; ৮৭ ঃ ৬]

কুরআনের সব আয়াত মনে রাখতে পারাটা রাসূল (দঃ)-এর প্রতি আল্লাহ'র একটি মুযেজা দান। দরকার মতো কুরআনের আয়াত মনে করতে পারার জন্য দীনের দাওয়াত দেয়াটা রাসূল (দঃ)-এর জন্য সহজ হয়েছিল – "সরল পথকে তোমার জন্য সহজ করে দেবো ।" *[সূরা আ'লা ; ৮৭ ঃ ৮]*

পুরো কুরআন মুখস্থ করতে পারা বা কুরআন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা আল্লাহ'র তরফ থেকে মুযেজা। এর মাধ্যমে কুরআনকে সংরক্ষণ করা ও এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে এটি কখনো বিকৃত হবে না বা মানুষ কুরআন ভুলে যাবে না। এই মুযেজা আজো অব্যাহত আছে। অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যারা কুরআনে হাফিজ অর্থাৎ না দেখে পুরো কুরআন স্মৃতি থেকে তেলাওয়াত করতে পারেন।

"আল্লাহ'র কিতাবের যে বাণী তোমার কাছে আসে তা তেলাওয়াত করো। কেউ আল্লাহ'র বাণীকে বদলে দিতে পারবে না। কখনোই তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে পাবে না ।*[সূর আল কাহফ ; ১৮ ঃ ২৭]*

৪. অলৌকিক কুরআন

কুরআন হলো আল্লাহ'র কথা যা এসেছে সবার জন্য ও শুধু সেই সময়ের জন্য নয় বরং পরবর্তী সব যুগেরই জন্য। কুরআনকে কেন মুযেজা বলা হবে তার অনেক কারণ রয়েছে। তিনটি প্রধান কারণ হলো ঃ অসাধারণ ভাষা শৈলী, বিষয়বস্তু ও আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষণ।

কুরআনের অসাধারণ ভাষা শৈলী

কুরআন আরববাসীর কাছে আরবী ভাষায় নাজিল হয়। এ নিয়ে কুরআনে বলা হয় – "কুরআন যদি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় আসতো, তাহলে তারা (কাফিররা) অবশ্যই বলতো, আল্লাহ'র আয়াত সহজভাবে নাজিল হয়নি কেন ? কী ? একজন আরবের কাছে অনারবী ভাষায় কুরআন ?

[সূরা ফুসিলাত/হা মীম আস সেজদা ; ৪১ ঃ ৪৪]

কুরআনের ভাষায় অসাধারণত্ব বুঝতে হলে সে সময়ের আরববাসীর ভাষা শৈলী সম্পর্কে জানতে হবে। কুরআন নাজিল হওয়ার সময়কালে আরবে কাব্য ও সাহিত্য ছিল অত্যন্ত উঁচুস্তরের। অত্যন্ত প্রতিভাবান সব কবি ছিলো যাদের আরবী ভাষায় ছিল খুবই ভাল দখল।

এসব সুদক্ষ কবিরা মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আদর্শ হিসাবে বিবেচিত ছিল। সাহিত্য ও অলংকারসমৃদ্ধ কাব্য রচনার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়ার কারণেই সাতজন কবির লেখা মুয়াল্লাকাত কবিতা সোনার হরফে লিখে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলানো হয়। (টীকা ৩)

এসব কবিতা বিভিন্ন উৎসবের যেমন উক্কাজের মেলায় সবার সামনে আবৃত্তি করে শোনানো হতো।

কাব্যচর্চা এত বহুল প্রচলিত ছিল যে এমন কী যাযাবর বেদুইনরাও কবিতা মুখস্থ ও চমৎকারভাবে আবৃত্তি করতে পারতো। অনেক সময় শহরের কবিদের মতো বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে বেদুইনরা আবৃত্তি করতো। মানুষেরা সেই আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হতো। (টীকা ৪)

আরবী ভাষা ও সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এমনই এক সময়ে কুরআন আরববাসীদের কাছে তাদের ভাষায় নাজিল হয়। রাসূল (দঃ) যখন মক্কার কাফিরদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান, তখন তারা তা শুনে মুগ্ধ হয়। অনেক মানুষ ইসলাম কবুল করে শুধুমাত্র কুরআনের চমৎকার বাণী শুনেই। কুরআন শুনে মুগ্ধ হয়ে যারা মুসলমান হন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন, উমর ইবনে আল খাত্তাব। তিনি আগে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। সূরা ত্বাহা'র প্রথম কয়েক লাইন শুনে অভিভূত হয়ে তিনি সত্য ধর্মকে মেনে নেন।

অনেক মানুষ কুরআন শুনে যদিও ইসলাম কবুল করেনি, তারা এর উত্তর দিতেও ব্যর্থ হয়। অবিশ্বাসীরা রাসূল (দঃ)-কে ঠাট্টা-তামাশা করে ও অভিযোগ আনে যে তিনি নিজেই কুরআন লিখেছেন।

'কাফিররা বলে ; কুরআন আর কিছুই না শুধু মিথ্যা কথা যা সে নিজে বানিয়েছে ও অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করে। কাফিররা অবিচার করছে ও মিথ্যা বলছে। তারা বলে ঃ কুরআন আগেকার লোকদের উপকথা যা মুহাম্মাদ (দঃ) নকল করেছে ও সেটা সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে পড়ে শুনানো হয়।"

[সূরা ফুরকান ; ২৫ ঃ ৪-৫]

এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভাষার অধিকারী আরবের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, আবৃত্তিকার ও অন্যান্যদের সামনে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন ঃ "আমার দাসের কাছে যা নাজিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে এরকম সমমানের আরেকটি সূরা রচনা করো। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য সাক্ষীদের ডেকে নাও যদি তোমারা সত্য বলে থাকো"। *[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ২৩]*

রাসূল (দঃ) কুরআন লিখেছেন এই অভিযোগের জ্ঞানগর্ভ উত্তর এর থেকে আর কী হতে পারতো ? – "তারা কি বলে রাসূল নিজেই এটা বানিয়েছে ? বলো ঃ তাঁহলে কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা বানিয়ে আনো আর এ কাজে আল্লাহ ছাড়া যাকে খুশী ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

[সূরা ইউনুস ; ২০ ঃ ৩৮]

আল্লাহ জানতেন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না।

"বলো ঃ যদি মানুষ ও জিন্ন সব একসাথে হয়ে কুরআনের মত কিছু লিখতে চায়, তাহলে তারা তা কখনোই পারবে না যদিও তারা একে অন্যকে সাহায্য করে।" *[সূরা ইসরা ; ১৭ ঃ ৮৮]*

"আর তারা কি বলে – সে নিজেই এটা বানিয়েছে ? বলো ঃ তাহলে কুরআনের সূরার সমমানের দশটি সূরা লিখো ও আল্লাহ ছাড়া যাকে খুশী ডাকো এ কাজে যদি তোমরা সত্যই বলে থাকো। যদি তারা উত্তর না দেয়, তবে জেনে রাখো কুরআন আল্লাহ'রই জ্ঞান থেকে এসেছে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কোন প্রভু নেই। তবুও কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হবে না ?"

[সূরা হূদ ; ১১ ঃ ১৩-১৪]

"তারা কি বলে, সে [মুহাম্মাদ (দঃ)] নিজেই এটা বানিয়েছে ? বলো ঃ তাহলে কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা নিয়ে আসো আর আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাকো এ কাজে যদি তোমরা সত্য বলে থাকো। না, আসলে তারা তাই অস্বীকার করছে যা তাদের জ্ঞানে তারা বুঝতে পারছে না ও যার অর্থ তাদের কাছে এখনো আসেনি। এভাবে আগের মানুষেরাও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। দেখে নাও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি। *[সূরা ইউনুস ; ১০ ঃ ৩৮-৩৯]*

বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বদিউজ্জমান সৈয়দ নুরসী আরবদের উপর কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে বলেন ঃ

কুরআন যখন আসলো তখন তা একই সাথে বিশেষজ্ঞদের সামনে চারটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ছিল।

প্রথমত, মানুষকে সেজদায় অবনত হতে বললো, তারা আশ্চর্য হয়ে তা শুনলো।

দ্বিতীয়ত, কুরআন আরবের বিখ্যাত কবি ও আবৃত্তিকারদের হতভম্ব করে দেয়।

নিজেদের ব্যর্থতায় স্তম্ভিত এসব কবির দল হতাশায় আঙুল কামড়াতে থাকে (আরবীতে হতাশা, ক্ষোভ, বিরক্তি বোঝাতে 'ক্রোধে আঙুল কামড়ানো' বলা হয়)। তাদের বিখ্যাত সাতটি কবিতা যা সে সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে বিবেচিত হতো ও সোনার হরফে কাবার দেয়ালে ঝুলে তাদের অহংকার বাড়াতো, সেই সম্মান ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, যারা জাদু-টোনা ও ভবিষ্যৎবাণী করতো তারা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে জানার চেষ্টা বন্ধ হয়। দুষ্ট জিনরা বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয় ও ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টার ইতি ঘটে।

চতুর্থত, কুরআন নানা ভুল তথ্য, জালিয়াতি, উপকথা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। জ্যোতির্বিদ্যা, অতীতের ঘটনা, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন মানুষকে সঠিক তথ্য দেয়।

এভাবে এই চারটি দল চমৎকৃত হয়ে কুরআনের সামনে মাথা নত করে ও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে কুরআনের ছাত্র হয়। এদের কেউ কুরআনের একটি আয়াতের সাথেও দ্বিমত পোষণ করতে সাহস পায়নি। (টীকা ৫)

কুরআন এমন একটি বই যার সমতুল্য কোন বই লিখতে আজো কোন মানুষ পারেনি। কুরআনের আরবী অত্যন্ত বিশুদ্ধ একটি ভাষা। আরবরা এখন যেভাবে কথা বলে, সেরকমটি নয়।

কুরআনের বার্তা স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত এরপরেও অলংকারসমৃদ্ধ। অনেক রূপক ও উপমা ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনের বার্তাকে সহজ করার জন্য ঃ

"আমি পুরো কুরআনে অনেক উদাহরণ দিয়েছি মানুষের জন্য কিন্তু অন্য কিছু থেকে মানুষ তর্ক করতে বেশি পছন্দ করে।" *[সূরা কাহফ ; ১৮ ঃ ৫৪]*

কুরআন হলো অত্যন্ত উচুস্তরের ও গভীর অর্থবোধক বই। কুরআনের উপর হালকা নজর দিলেই বোঝা যায় সীমিত সংখ্যা (দুই হাজারের মতো) শব্দ দিয়ে অসংখ্য আদেশ, মতবাদ ও জ্ঞান মানুষকে দান করা হয়েছে।

কুরআনে অনেক কিছু বারবার বলা হয়েছে যার ফলে পাঠকের জন্য বুঝতে পারা ও মনে রাখা সহজ হয়।

"আমি কুরআনকে বুঝতে পারা ও মনে রাখার জন্য অবশ্যই সহজ করে দিয়েছি ..." *[সূরা কামার ; ৫৪ ঃ ১৭]*

যদিও কিছু কথা বারবার এসেছে, এরপরেও কুরআন পড়ার সময় মনে হয় না এটা পুনরাবৃত্তি। জীবনভর কুরআন বারবার পড়ে গেলেও কেউ ক্লান্ত হয় না বা কুরআনের মাধুর্য অনুভব করতে অসুবিধা হয় না।

"আল্লাহ পাঠিয়েছেন ধর্ম বিষয়ে সেরা উপদেশ, একটি কিতাব যাতে পুনরাবৃত্তি রয়েছে সুসংহতভাবে।" *[সূরা যুমার ; ৩৯ ঃ ২৩]*

কুরআনের বিষয়বস্তু

কুরআন হলো, ঐশী বাণী। মানবজাতির জন্য এতে রয়েছে আল্লাহ'র তরফ থেকে হেদায়েত। নিজেকে চিনতে এটি মানুষকে সাহায্য করে, কুরআন মানুষকে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে এমন সব তথ্য দেয়, যা কোন মানুষ বা জিন – ফিরিশতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কুরআন যা বলে তা সত্য।

এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য বা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা গিয়েছে, যা চৌদ্দশত বছর আগেই কুরআনে বলা হয়েছে। জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সত্য প্রকাশ, অজ্ঞতা দূর ও মানব চরিত্র সম্পর্কে গোপন রহস্য প্রকাশ-এসব দিক থেকেই কুরআন অতুলনীয়। কুরআনের ঐশ্বরিক চরিত্র ওহী নাজিলের শুরুর সময় থেকে ভবিষ্যতের সব মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কুরআনের আদেশ-নিষেধ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আগে যেমন ছিল, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতেও মানুষের জন্য কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য। "... কুরআনের জাহান্নামের এই বর্ণনা আর কিছুই নয় বরং পুরো মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ'র সতর্ক বাণী।" *[সূরা মুদ্দাসসির ; ৭৪ ঃ ৩১]*

"... আর এই (কুরআন) তো আর কিছু নয় বরং পুরো বিশ্বজগতের জন্য সতর্কবাণী।" *[সূরা কালাম ; ৬৮ ঃ ৫২]*

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাঁর মর্যাদা, শক্তি, সৃষ্টির প্রতি করুণার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান যে এই মহাবিশ্বের তিনিই স্রষ্টা, জাগতিক

সব চাহিদা থেকে তিনি মুক্ত। আল্লাহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

আমরা যে স্রষ্টার উপাসনা করি, তার সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানাটা জরুরী – যেন আমরা স্রষ্টার করুণার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি ও বেশি বেশি করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার সংগ্রাম করতে পারি।

কুরআনে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেছেন সরাসরি। ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেছেন, সমাজের জন্য বলেছেন, মুসলমান – অমুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে তিনি তাঁর বাণী দিয়েছেন, সমর্থন ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, সুখবর দিয়েছেন, দিয়েছেন সতর্ক বাণী।

আল্লাহ জানান তিনি আমাদের বন্ধু, সাহায্যকারী, বিপদের সময় মানুষ যেন তাঁরই সাহায্য চায়। যেহেতু আল্লাহ সব কিছুরই স্রষ্টা, তিনি জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটা ভাল – ব্যক্তি ও সমগ্র মানজাতির জন্যই এটা প্রযোজ্য। সেজন্য তিনি কুরআনে মানুষের জন্য প্রযোজ্য তাঁর আইনের কথা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ'র নির্দেশিত সীমারেখায় আমাদের থাকতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কী ভাল, কী খারাপ, কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ – "তিনিই তোমার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন ; এতে সুস্পষ্ট কিছু আয়াত রয়েছে – সেটাই হলো কিতাবের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ ..."। *[সূরা ইমরান ; ৩ ঃ ৭]*

কুরআনে যে পথ দেখানো হয়েছে, তা জ্ঞানে ভরা ও সহজেই বোঝা যায়। কুরআনের আয়াতে যে আদেশ ও নিষেধ আছে তা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আল্লাহ যাকে সত্য পথে পরিচালিত করেছেন, সেই বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন অসুবিধা ছাড়াই কুরআনের নির্দেশ বোঝা ও মেনে চলা সহজ।

কুরআন শুধু আইনের কোন বই নয় বরং তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, কিভাবে দেহ ও আত্মার জন্য কল্যাণকর এটি। অপ্রত্যাশিত বিপদ বা যেকোন কঠিন সময়ে কী করতে হবে, আল্লাহ কুরআনে তা জানিয়ে দিয়েছেন। মানব চরিত্রের নানা দিকও কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যক্তির রোজকার ও সমাজ জীবনের নানা সমস্যা দূর করার জ্ঞান আল্লাহ কুরআনে দান করেছেন। অন্য কথায়, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে কাটাতে হবে, সমস্যা তা যতই জটিল হোক না কেন কিভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে, সেই জ্ঞান দেয়া আছে কুরআনে।

কুরআন থেকে তারাই সান্ত্বনা আর উপদেশ নিতে পারে যারা আল্লাহকে ভয় পায়; তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, যারা আল্লাহ'র কাছে আত্মসমর্পণকারী ও এই দুনিয়া থেকে পরকালের জীবনকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না, না কি তাদের মন তালাবদ্ধ ?"

[সূরা মুহাম্মাদ ; ৪৭ ঃ ২৪]

আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে সাহায্য করতে কুরআনে অতীতে অনেক মানুষ ও জাতির কাহিনী বলা হয়েছে ... তারা ছিল আল্লাহকে অস্বীকারকারী বা অবাধ্যতাকারী।

আমরা জানতে পারি সেসব অবাধ্যতাকারীদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল ও কিভাবে তারা শাস্তি পেয়েছিল। কুরআনে এসব কাহিনী বলা হয়েছে যেন অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। এটা আল্লাহ'র রহমত আমাদের প্রতি... "কুরআনে বেশ কিছু নগরীর কথা তোমার কাছে বলেছি ; এসব শহরের কিছু এখনো দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকীগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে"।

[সূর হূদ ; ১১ ঃ ১০০]

অতীতের কাহিনীগুলি অবিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণ দেয় যে কুরআন স্রষ্টার বাণী। কেননা, রাসূল (দঃ)-এর পক্ষে কোনভাবেই অতীতের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানা সম্ভব ছিল না ; কেননা তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না ; কোন শিক্ষক বা কোন চিন্তাবিদ তাকে লেখাপড়া বা অন্য কিছু শেখান নি। তিনি খুব বেশি দেশও ঘুরে বেড়ান নি। এসবই প্রমাণ যে তাঁর পক্ষে কোনভাবেই কুরআন লেখা সম্ভব ছিল না।

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরা কুরআনে বর্ণিত অতীতের অনেক ঘটনার প্রমাণ পেয়েছেন .... (টীকা ৬)।

"এসব কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য আছে শিক্ষা। এসব বানানো কাহিনী নয় ; কুরআন আগেকার কিতাবগুলির সমর্থক ও সব কিছুর ব্যাখ্যা আছে এতেও মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।" *[সূরা ইউসুফ ; ১২ ঃ ১১১]*

কুরআনের আদেশ-নিষেধ দেয়া হয়েছে যাতে আমরা পরকালে সফল হতে পারি। ঈমান ও আমল অনুযায়ী আমরা পরকালে কিভাবে পুরস্কৃত হবো, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ভাল কাজে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরআনে বেহেশতের বাগানের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাতে একা পেতে আমরা

সংগ্রাম করি ও আল্লাহ'র ইচ্ছায় তা পেয়ে যাই। একইভাবে দোযখের ছবিও বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যাতে আমরা কখনো অবিশ্বাসী না হয়ে পড়ি ; প্রকাশ্যে বা ভুল করেও অন্য কাউকে আল্লাহ'র শরীক না করি ; খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করি।

"কুরআন তোমাকে ও তোমার জাতিকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ'র সতর্ক বার্তা ঃ কুরআনের ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।"

[সূরা যুখরুফ ; ৪৩ ঃ ৪৪]

আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি আমাদেরকে ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেন স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করি – "আর আল্লাহ'র নিদর্শনসমূহের মধ্যে আছে আকাশ ও ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য ; যারা জ্ঞানী তাদের জন্য এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।" *[সূরা রুম ; ৩০ ঃ ২২]*

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে বৈজ্ঞানিক সূত্রের উল্লেখ আছে। গবেষকরা এসব তথ্যাদি সাম্প্রতিক সময়ে জানতে পেরেছে উন্নত প্রযুক্তি, কখনো বা জটিল গাণিতিক হিসাব-নিকাশের সাহায্যে। যে সময় কুরআন নাজিল হলো সে সময় এসব বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মানবজাতির জন্য স্রষ্টার তরফ থেকে কুরআন এসেছে – এটা যারা বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য এটি একটি চিন্তার বিষয়।

৭ম শতাব্দীতে যখন কুরআন নাজিল হয়, তখন এই বিশ্বজগত সম্পর্কে আরবদের মধ্যে নানা ধরনের মিথ্যা তত্ত্ব ও উপকথা প্রচলিত ছিল। সে সময় আরবদের কাছে এমন কোন জ্ঞান প্রযুক্তি ছিল না, যাতে তারা পৃথিবী বা মহাজগত বা প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রচলিত গল্প-কাহিনীতে বিশ্বাস রাখতো যেমন উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত আকাশকে ধরে রাখে ; পৃথিবী হলো সমতল ও এর দুই প্রান্তে উঁচু পাহাড় স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আকাশকে ধরে রাখে। এসব প্রচলিত কল্প কাহিনী ও কু-সংস্কার দূর হলো ওহী নাজিলের মধ্য দিয়ে – "তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশকে উপরে সৃষ্টি করেছেন কোন স্তম্ভ ছাড়া"। *[সূরা রাদ ; ১৩ ঃ ২]*

বেশিরভাগ মানুষই কিছুই জানতো না এমন অনেক বিষয়ে ওহী নাজিল হয়। কুরআন যে সময় এই দুনিয়ায় আসে, মানুষ জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা,

জীববিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে খুবই কম জানতো। কুরআন মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। এমন কী কুরআনে এমন সব তথ্য আছে যা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারা এখনো সম্ভব হয়নি ; কেননা সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট জ্ঞান মানুষের এখন নেই।

এই দুনিয়ার ও পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কুরআনে অনেক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে – এটা কুরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যদিও কুরআনে এমন কিছু তথ্য আছে যা কেবল জ্ঞানীরাই বুঝবে, একইসাথে এতে সাধারণ মানুষের বোঝার মতো সহজ-সরল কথাও আছে।

কুরআন বুঝতে হলে দরকার আন্তরিকতা। কুরআন পুরো মানবজাতির তবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, তারাই কেবল কুরআন থেকে সৎ পথের নির্দেশ পাবে।

"এগুলি জ্ঞানগর্ভ কুরআনের আয়াত – যা হিদায়েত ও রহমত ভাল মানুষদের জন্য" *[সূরা লুকমান ; ৩১ : ২-৩]*

"হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে সতর্কবাণী এসেছে ও বিশ্বাসীদের জন্য অন্তরের প্রশান্তি, হেদায়েত ও ক্ষমা।" *[সূরা ইউনুস ; ১০ : ৫৭]*

বদিউজ্জামান সৈয়দ নূরসী বলেন, আল্লাহ'র অনুগত দাসদের জন্য কুরআন হলো, সত্যের পথ-প্রদর্শক। সব জ্ঞানের ভাণ্ডার কুরআন মানুষের সচেতনতা ও বিবেচনাবোধের নেতৃত্বদানকারী, নর-নারী ও জ্বীনের পথ প্রদর্শক ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তি চায় যারা তাদের শিক্ষক ও সত্যকে খুঁজে পেতে চায় তাদের প্রশিক্ষক (টীকা-৭)।

কুরআন জানায়, আল্লাহ'র বাণী পরিপূর্ণভাবে আমাদের কাছে এসেছে ও একজন মানুষ তখনই সত্যকে পাবে যখন সে কুরআন ও রাসূলের আদর্শকে অনুসরণ করবে– "... আমি কুরআনে কোন কিছু উপেক্ষা করি নি"।

[সূরা আনাম ; ৬ : ৩৮]

"... আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, কুরআন তোমার রবের কাছ থেকে সত্যসহ এসেছে। তাই কোন অবস্থাতেই তুমি সন্দেহবাদীদের একজন হবে না। সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার রবের বাণী একদম নিখুঁত। তাঁর বাণী বদলে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি সব শুনেন, সব জানেন"। *[সূরা আনআম ; ৬ : ১১৪-১১৫]*

কুরআনের সংরক্ষণ

কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর কাছে এটা যেভাবে এসেছিল, আমরা ঠিক সেই অবিকৃত কুরআনই আজো আমাদের মাঝে পাই।

"আমিই কুরআন পাঠিয়েছি ও আমিই একে হেফাযত করবো।"

[সূরা হিজর ; ১৫ : ৯]

"... আল্লাহ'র বাণী কেউ বদলে দিতে পারবে না।" *[সূরা কাহফ ; ১৮ : ২৭]*

কুরআন আল্লাহ'র তরফ থেকে আসা প্রথম আসমানী কিতাব নয়। কুরআন বলছে :

"আল্লাহ সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছেন তোমার কাছে যা আগের কিতাবগুলির সত্যায়ন করে। আর তিনিই পাঠিয়েছিলেন তাওরাত ও ইনজিল মানুষের হেদায়েতের জন্য... ।" *[সূরা ইমরান ; ৩ : ৩-৪]*

কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য হলো, এটা আল্লাহ'র সর্বশেষ কিতাব ও আজ থেকে চৌদ্দশত বছরেরও আগে যেভাবে কুরআন পড়া হতো ঠিক সেভাবেই আজো পড়া হয়। সব যুগেই কুরআন অবিকৃত থাকবে।

আগের আসমানী কিতাবগুলি যেভাবে রাসূল (দঃ)-দের কাছে এসেছিল, আজ আর সেভাবে নেই – পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ সেগুলির পরিবর্তন, সংযোজন করেছে। কখনো বা পুরো অধ্যায়ই বাদ দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর কাছে যখনই ওহী নাজিল হতো, আল্লাহ অলৌকিকভাবে তা রাসূল (দঃ)-এর মনে স্থায়ী করে দিতেন অর্থাৎ রাসূল (দঃ) তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন। মুখস্থ করার পাশাপাশি রাসূল (দঃ) সাহাবীদেরকে দিয়ে আয়াতগুলি লিখিয়েও রাখতেন। সাহাবীদের মধ্যে যারা আয়াত লিখে সংরক্ষণ করতেন, তাদেরকে বলা হয় ওহী লেখক।

এভাবে কুরআন লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়। খলিফা আবু বকর (রাঃ)-এর সময় কুরআনের একটি কপি বাঁধাই করা হয়। খলিফা ওসমান (রাঃ)-এর সময় কুরআনের একাধিক কপি তৈরি করে ইসলামের প্রধান প্রধান নগরীতে পাঠানো হয়। ঐশ্বরিক উপায়ে কুরআনকে অবিকৃত রাখা হয়েছে এবং আল্লাহ'র ইচ্ছাতেই কুরআন তাই এত শক্তিশালী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী কিতাব।

"... নিশ্চয়ই এটি অতি সম্মানিত কিতাব। কোন মিথ্যা এতে আসতে পারে না– সামনের থেকেও না, পিছনের থেকেও না। এই কুরআন তাঁর কাছ থেকে এসেছে যিনি অতি জ্ঞানময়, সব প্রশংসার মালিক।" *[সূরা ফুসিলাত ; ৪১ ঃ ৪১-৪২]*

"যদি আমি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে পেতে আল্লাহ'র ভয়ে পাহাড় নত ও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। আমি এসব উদাহরণ দেই যাতে মানুষ ভেবে দেখে।" *[সূরা হাশর ; ৫৯ ঃ ২১]*

কুরআন তেলাওয়াতে লাভ অনেক। কুরআনকে বুঝতে পারলে শুধু এই দুনিয়ায় নয় বরং পরকালেও অনেক লাভ আছে।

"... তোমাদের কাছে আল্লাহ'র কাছ থেকে এসেছে নূর ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ এ কুরআন দিয়ে তাঁদেরকে শান্তির পথে নিয়ে যাবেন। আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে তাঁদেরকে আলোতে আনবেন ও সরল পথে নিয়ে যাবেন।" *[সূরা মায়িদা ; ৫ ঃ ১৫-১৬]*

"মানুষের জন্য এটা অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।"
[সূরা জাসিয়া ; ৪৫ ঃ ২০]

রাসূল (দঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিনে কুরআন হবে সুপারিশকারী। যে কুরআনকে সঙ্গী করেছে, কুরআন তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে ; যে কুরআনকে পিছনে ফেলে রাখতো, কুরআন তাকে দোযখে নিয়ে যাবে (বর্ণনাকারী ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ)।

কুরআন তেলাওয়াত মনকে শান্ত রাখে, হৃদয়ে শান্তি দেয়। এটা আত্মার খোরাক। বিশ্বাসীদের জন্য কুরআন আল্লাহ'র তরফ থেকে পথ – প্রদর্শক ও ক্ষমা ঃ "কেবল মাত্র আল্লাহ'র স্মরণেই (যিকির, ইবাদতে) মনে শান্তি আসবে।" *[সূরা রাদ ; ১৩ ঃ ২৮]*

"যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন শান্তভাবে তা শুনো যাতে আল্লাহ'র ক্ষমা পেতে পারো।" *[সূরা আরাফ ; ৭ ঃ ২০৪]*

৫. হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর অসাধারণ মহৎ চরিত্র এটাও এক মুযেজা

আল্লাহ'র কাছে রাসূল (দঃ) একজন সম্মানিত মানুষ ও আল্লাহ'র বিশেষ রহমত রয়েছে তাঁর উপর। আল্লাহ রাসূল (দঃ)- কে তাঁর এক অনুগত দাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন ও দুনিয়াতে তাঁকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাসূল (দঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আস্থাভাজন। সততার দিক থেকে তিনি ছিলেন সবার আদর্শ। তিনি আল্লাহ'র একজন মহান রাসূল (দঃ) যার তাকওয়া, উন্নত স্বভাব-চরিত্র ছিল অনুকরণীয়। তাঁর সহানুভূতি, ভদ্রতা, অসাধারণ সহমর্মিতা, স্রষ্টাতে বিশ্বাস, ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদির জন্য তিনি হলেন সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক নেতা ও আমাদের সবারই আদর্শ।

রাসূল (দঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-এর নাতি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন ঃ যখনই রাসূল (দঃ)-এর মহৎ চরিত্র নিয়ে আলী (রাঃ) কিছু বলতেন, তিনি সাধারণত এভাবেই বলতেন, "তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র, সবচেয়ে বিশ্বাসী, সবচেয়ে দয়ালু হৃদয়ের। তাঁকে দেখার পর সবার মনেই শ্রদ্ধা জাগতো। যে কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতো ও অপূর্ব স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারতো, সেই রাসূল (দঃ)-কে ভালবেসে ফেলতো। আমি তাঁর মতো কাউকে আগেও দেখিনি, পরেও না।" (আল তিরমিযী)

রাসূল (দঃ) নিজ জাতির কাছে পরিচিত ছিলেন আল আমিন বা বিশ্বাসী বলে। সবাই একমত ছিল যে রাসূল (দঃ) হলেন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। রাসূল (দঃ)-এর চেহারায় এক পবিত্র নূর চমক দিতো যা দেখে মানুষ প্রভাবিত হতো ও তাঁর সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হতো। যারা তাঁর কথা শুনতো বা তাঁর সাথে আলাপ করতো, তারা বুঝতে পারতো ইনি একজন বিশেষ কেউ। তারা অনেক প্রমাণ পেতো যে ইনি একজন নবী। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

রাসূল (দঃ)-এর চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য এমন কী অমুসলিমরাও তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে যেত।

রাসূল (দঃ)-এর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা সাহাবীরা সবসময়ই প্রত্যক্ষ করতেন। এই বিষয়ে ইবনে আসকাবের কাছ থেকে শুনে ইবনে সাদ এভাবে বর্ণনা করেন– আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) সততার দিক থেকে সবার মধ্যে সেরা ছিলেন। স্বভাবে ছিলেন সবচেয়ে মধুর। সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সবচেয়ে নিখুঁত, পাড়া-প্রতিবেশিদের সাথে ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র, সৌজন্যতা ও নিরাপত্তা প্রদানে ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী, ছিলেন সত্যবাদী ও ভাল, ভদ্র ব্যবহারের প্রতি যিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। রাসূল (দঃ) এসব ভাল গুণেরই অধিকারী ছিলেন – এসব কারণে সবাই তাঁকে আল-আমীন ডাকতো – সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। (টীকা ৮)

ইবনে হিশাম বলেন, অজ্ঞতার যুগ থেকে শুরু করে ইসলাম আসা পর্যন্ত সবাই যে যার মতবিরোধ মেটাতে রাসূল (দঃ)-এর কাছে আসতো (টীকা ৯) (বর্ণনাকারী ইবনে সাদ)।

ইবনে সিহাব জানান ঃ কুরাইশরা যখন কাবাঘর মেরামতসহ নতুন করে বানানো শুরু করে, হজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর কিভাবে বা কারা কাবাঘরে বসাবে তা নিয়ে সবাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। আরবের সব গোষ্ঠীর লোকেরাই চাচ্ছিলো তারাই এই পাথর কাবা ঘরে স্থাপন করবে। তারা বললো, "যে এই পথ দিয়ে প্রথম আসবে, তাকেই আমরা বিচারক বানাবো আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য।" রাসূল (দঃ) ঐ রাস্তা দিয়ে প্রথম আসলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বলা হয়, তাঁর বয়স তখন ছিল ৩৫।

সবাই তাঁকে বিচারক হিসেবে মেনে নিলো। রাসূল (দঃ) বললেন, একটা চাদর এনে মাটিতে বিছাও। তারপর তিনি বললেন, "একসাথে ধরে পাথরটি চাদরের উপর রাখো। এরপর বললেন, নিজ নিজ দলের প্রবীণতম ব্যক্তি এসে চাদরের কোণা ধরুক। সব দলের প্রতিনিধিত্বকারীরা চাদর ধরে পাথর কাবার কাছে নিয়ে গেল। এরপর রাসূল (দঃ) নিজ হাতে তাদের কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে কাবাঘরে বসিয়ে দিলেন।

নবী (দঃ) বড় হওয়ার সাথে সাথে সবার থেকেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। সততার কারণে তিনি যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, সে কারণে তিনি পরিচিত ছিলেন আল-আমীন বা সবচেয়ে বিশ্বাসী হিসেবে। এসব ওহী নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা (টীকা ১০)।

যদিও কুরআন নাজিল হওয়ার পর রাসূল (দঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসীদের মনোভাব পাল্টে যায়। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় ইসলামের প্রসার বন্ধ করার জন্য যদিও তারা সবসময় দেখে এসেছে নবী (দঃ) স্বভাব-চরিত্রে কতটা ভাল, তবুও তারা নবীর (দঃ) ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ "এরা অবাক হয় যে তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন। কাফিররা বলে ঃ এ এক মিথ্যাবাদী জাদুকর।"

[সূরা সাদ ঃ ৪]

যারা আল্লাহ'র নির্বাচিত ও রহমতপ্রাপ্ত ভাল মানুষের নামে অপবাদ দেয়, তারা কিন্তু তার মহত্ত্বের সাক্ষী ছিল। নিজ চোখেই তারা দেখেছিল নবী (দঃ)

কিভাবে কথা দিয়ে কথা রাখেন। তাঁর বিশ্বস্ততা, ন্যায়-বিচার, সততা, সত্যবাদিতা, বিধবা, এতিম ও দুঃখীর প্রতি দয়া এবং সবার সাথেই তাঁর ভদ্র ব্যবহার – এসবই ছিল তাদের জানা। নবীর (দঃ)-এর অসাধারণ মহৎ স্বভাব সবসময়ই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতো। তিনি ছিলেন মানুষের বিশ্বাসভাজন বন্ধু, ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র।

ইসলামিক সূত্র মতে নবীর (দঃ) নামে অপবাদ দেয় নাদর ইবনে আল হারিথ। একদিন ঐ ব্যক্তি কুরাইশ নেতাদের সাথে দেখা করে ও বলে ঃ হে কুরাইশগণ! আমি শপথ করে বলছি আজ তোমরা যার মোকাবেলা করছো, সে রকম কিছু আগে তোমাদের কখনো করতে হয়নি। ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মাদ (দঃ) ছিল তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে শ্রদ্ধার। যখন সে বড় হয়ে আল্লাহ'র বাণী নিয়ে এলো, তখন তোমরা বললে সে জাদুকর। আমি শপথ করে বলছি সে জাদুকর নয় – আমরা অনেক জাদুকর ও তারা কিভাবে ঝাড়-ফুঁক করে সেসব দেখেছি। এরপর তোমরা বললে সে গণক। আমি শপথ করছি সে গণক নয়। আমরা কত গণক দেখেছি, তাদের কথা শুনেছি, তোমরা বললে সে কবি– আমি শপথ করছি সে কবি নয়। কত কবিতাই না আমরা শুনেছি, শিখেছি, কবিতার ছন্দ বুঝেছি। তোমরা বললে সে পাগল– শপথ করছি সে পাগল নয়। তাঁর মধ্যে কোন পাগলামি নেই, পাগলের মতো মূর্ছা যাওয়া বা অর্থহীন প্রলাপ – কিছুই তার মধ্যে নেই। কুরাইশরা, ভালভাবে চিন্তা করো ও সিদ্ধান্ত নাও। (টীকা ১১)

রাসূল (দঃ)-এর অপূর্ব চরিত্র সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজ্জালী বর্ণনা করেন। তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলক আত তিরমিযী, আত তাবারানী, ইমাম আল-বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমেদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ থেকে। রাসূল (দঃ) ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও সাহসী মানুষ ; সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষমা প্রদর্শনকারী মানুষ, সবচেয়ে দয়াশীল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (দঃ) এর জন্য যে জীবিকা ও খাদ্য সম্ভারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, রাসূল (দঃ) কখনোই তার থেকে এক বছরের বেশি কিছু জমা রাখতেন না। বেশি খাবার থাকলে তা গরীবদের মাঝে দান করতেন। কেউ কিছু চাইলে তা তিনি দিয়ে দিতেন। এমন কী তাঁর কাছে যা আছে তার বেশিও তিনি দান করতেন। তিনি সবসময় সত্য বলতেন যদিও তা কখনো কখনো তাঁর নিজের ও সাহাবীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতো।

তিনি বিয়ের দাওয়াত কবুল করতেন, অসুস্থ মানুষকে দেখতে যেতেন, জানাযায় অংশ নিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, অহংকারমুক্ত ; বক্তব্য দীর্ঘ না করেই তিনি চমৎকারভাবে কথা বলতেন। তাঁর সংবিধান ছিল সুন্দরতম।

তিনি অসুস্থ মানুষকে দেখতে অনেক দূরেও চলে যেতেন – গরীব, দুঃস্থদের পাশে বসতেন, তাদের সাথে খেতেন, যারা ভাল মানুষ তাদেরকে সম্মান করতেন, আরো ভাল কাজ করতে উপদেশ দিতেন, আত্মীয়দের প্রতি দয়া দেখাতে বলতেন। তিনি কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। কেউ কোন ওজর পেশ করলে তা মেনে নিতেন।

তিনি কৌতুক করার সময়েও সত্য বলতেন। নির্দোষ খেলায় তিনি অংশ নিতেন। স্ত্রীর সাথে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। কোন গরীবকে তার অভাবের জন্য নবী (দঃ) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন না। কোন ধনীকে তার সম্পদের জন্য আলাদা খাতির দেখাতেন না। তিনি মানুষকে আল্লাহ'র পথে ডাকতেন। (টীকা ১২)

রাসূল (দঃ)-এর মহৎ চরিত্র, প্রতিকূলতার মুখে তাঁর অসাধারণ দৃঢ়তা, তাঁর উদার-ভদ্র স্বভাবের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। রাসূল (দঃ)-এর গুণাবলীর কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে।

"তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে যা কখনো শেষ হবে না ; অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের।" *[সূরা কালাম ; ৬৮ ঃ ৩-৪]*

"... নিশ্চয়ই কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহক [জিবরাইল (আঃ)] নিয়ে এসেছেন।" *[সূরা হাক্কা ; ৬৯ ঃ ৪০]*

আল্লাহ'র সাহায্য ও আসমানী কিতাব নাজিল এবং রাসূল (দঃ)-এর চরিত্রের দৃঢ়তায় একটি জাতি মাত্র ২৩ বছরে অন্ধকার থেকে আলোতে আসে। যে মানুষেরা তাদের নারীদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করতো, সন্তানের সাথে এতটাই নির্মম ছিল যে শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দিতো, যারা গরীব আর দাসদের প্রতি ছিল নিষ্ঠুর – তারাই ইসলামের আলো পেয়ে হলো সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

যে মানুষেরা নানা রকম পাথর আর মূর্তির পূজা করতো, নানা কু-সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল, তারা এখন এক মহান স্রষ্টায় বিশ্বাসী। এই চরম ও স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য রাসূল (দঃ)-কে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। মুশরিকরা রাসূল (দঃ)-কে প্রস্তাব দিয়েছিল যদি তিনি আল্লাহ'র কথা বলা বন্ধ করেন, তবে তাঁকে

অনেক ধন-সম্পদ ও অন্যান্য কিছু উপহার দেয়া হবে। কিন্তু রাসূল (দঃ) এসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

[অনুবাদকের সংযোজন ঃ রাসূল (দঃ) তাঁর চাচাকে বলেন ঃ "আল্লাহ'র শপথ। যদি কাফিররা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদকেও এনে দেয়, আমি ইসলাম প্রচার করা থেকে কখনোই থামবো না – যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে বিজয় অথবা মৃত্যু দেন।"]

তিনি ছিলেন নীতিপরায়ণ মানুষ। তিনি আল্লাহ'র অনুমোদন রয়েছে ও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এমন কিছুর কামনা করতেন। কঠিনতম দুঃসময়েও তিনি শুধু আল্লাহ'র সাহায্যই কামনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাঁকে ও বিশ্বাসীদেরকে জয়ী করবেন। আল্লাহ তাঁকে ও বিশ্বাসীদেরকে সমর্থন করেছেন ও অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

উম্মী হওয়ার পেছনে ঐশ্বরিক রহস্য

রাসূল (দঃ) যখন ওহী লাভ করেন, তখন তিনি লিখতেও জানতেন না, পড়তেও পারতেন না। এককথায় উম্মী। উম্মী অবস্থায় কুরআন লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে তিনি হলেন সত্যিই রাসূল (দঃ)। অবিশ্বাসীরা যদিও জানতো যে রাসূল (দঃ)-কে কোন মানুষ কখনো লেখাপড়া শেখায় নি, তবুও কাফিররা এটা মেনে নেয়নি যে কুরআন আল্লাহ'র বাণী। তারা বরং অভিযোগ তুলে যে রাসূল (দঃ) নিজেই এটা লিখেছেন। অথচ ঐ কাফিররা নবুয়ত প্রাপ্তির অনেক আগে থেকেই রাসূল (দঃ)-কে চিনতো ও ভালভাবেই জানতো যে কুরআন লেখার মতো জ্ঞান তাঁর নেই।

কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ "তোমার কাছে ফিরিশতা পাঠিয়েছি আমার আদেশে ; তুমি জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী ; আমি কুরআনকে করেছি নূর যাকে দিয়ে আমার যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করি। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ দেখাও...।" *[সূরা শুরা ; ৪২ ঃ ৫২]*

"... আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন কিতাব ও জ্ঞান ও শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার উপর আল্লাহ'র অসীম অনুগ্রহ রয়েছে।"
[সূরা নিসা ; ৪ ঃ ১১৩]

রাসূল (দঃ) মানবজাতির কাছে কুরআন পৌঁছে দেন স্রষ্টার কাছ থেকে আসা বাণী হিসেবে। তিনি কখনোই নিজেকে লেখক বা কবি হিসেবে দাবি করেন নি।

তিনি মানুষকে মনে করিয়ে দিতেন যে নবী হওয়ার বহু আগে থেকেই তারা তাঁকে চিনে – "আল্লাহ না চাইলে আমি তোমাদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করতাম না ও তিনিও তোমাদেরকে এটা জানাতেন না। কুরআন আসার অনেক আগে থেকেই তো আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে আছি ; তোমরা কী ভেবে দেখবে না ?"

[সূরা ইউনুস ; ১০ ঃ ১৬]

উম্মী হওয়ার পরেও রাসূল (দঃ) খুবই সার্থকভাবে আল্লাহ'র বাণী মানুষের কাছে নিয়ে যান। আগেকার আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইনজিলের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ)-কে দান করেন। আল্লাহ যখন রাসূল (দঃ)-কে কুরআনের বাণী পাঠান, তখন আগের কিতাব ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ'র ওহী ছাড়া রাসূল (দঃ)-এর পক্ষে অতীতের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল না।

রাসূল (দঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে আল গাজ্জালী আরো বলেন ঃ

তাঁর স্বভাব ও আচরণ, কাজ, অভ্যাস, ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর ব্যবহার, সবাইকে সত্য পথ দেখানো, কঠিন কঠিন বিভিন্ন প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দান, মানুষের কল্যাণে তাঁর ক্লান্তিহীন চেষ্টা, শরীয়াহ আইনের প্রতি তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব – এ সবকিছুই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে যেকোন মানুষের পক্ষে এসব করা সম্ভব নয় – স্রষ্টার অদৃশ্য শক্তির সাহায্য ছাড়া। কোন মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড মানুষের পক্ষে এরকম করা অসম্ভব।

রাসূল (দঃ)-এর শাসনতন্ত্র ও চারিত্রিক গুণাবলী দেখে মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছে যে তিনি আল্লাহ'র পাঠানো এক মহান সত্যবাদী মানুষ। আল্লাহ তাঁকে এসব গুণ দান করেছেন যদিও তিনি ছিলেন উম্মী ও বাস করতেন অশিক্ষিত আরবদের মাঝে। নিরক্ষর, এতিম ও প্রতিপত্তিহীন হওয়ার পরও তিনি কিভাবে এত সুন্দর স্বভাব-চরিত্র এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেন জাগতিক বা ঐশ্বরিক শিক্ষা ছাড়া ? আগেকার নবী ও রাসূলদের (দঃ) সম্পর্ক সত্য, সঠিক জ্ঞান এটাই প্রমাণ করে যে তিনি সত্যিই আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)। কেননা, তিনি ওহীর মাধ্যমেই এসব জানতে পারেন। ওহীর জ্ঞান ছাড়া তিনি আর কিভাবে এসব জানবেন ? (টীকা ১৩)

যারা তাঁকে চিনতো – এমনকি অবিশ্বাসীরাও জানতো যে রাসূল (দঃ) কখনো জ্ঞানী মানুষদের কাছ থেকে কোন শিক্ষা পাননি। কাজেই রাসূল (দঃ)-এর বার্তার মধ্যে যে জ্ঞান ছিল, তা কেবল স্রষ্টার কাছ থেকে অলৌকিক উপায়েই পাওয়া সম্ভব।

আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ "তুমি এর আগে কোন বই পড়ো নি বা লেখো নি। যদি এমনটি হতো তাহলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করতো।"

[সূরা আনকাবুত ; ২৯ ঃ ৪৮]

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সিরাহ জানায় মুহাম্মাদ (দঃ)-এর মহান জ্ঞানই প্রমাণ দেয় যে তিনি আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)। মুহাম্মাদ (দঃ) একজন উম্মী– না তিনি পড়তে জানতেন না জানতেন লিখতে।

আজীবন তিনি যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন, যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল ও মক্কার জনগণ – কেউই কখনো দেখে নি যে তিনি কোন বই বা কলম ধরেছেন।

তাই তাঁর কাছে যা নাজিল হয়েছে – জ্ঞানের সমুদ্র কুরআন সত্যিই অলৌকিক কিছু। এতে রয়েছে আগের সব আসমানী কিতাবের অমূল্য তথ্য সম্পদ ; নবী ও রাসূলদের (দঃ) কাহিনী ; বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ– নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এত সব তথ্য সমৃদ্ধ বই অবিশ্বাসীদের সামনে পেশ রাসূল (দঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। (টীকা ১৪)

ইয়াহুদী পণ্ডিতরা রাসূল (দঃ)-কে চিনেছিলেন

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে কুরআনে 'আসমানী কিতাবের মানুষ' বলা হয়েছে। এদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণে অনেক দোষ-ত্রুটি ঢুকে পড়েছে ; তবুও তারা এমন ধর্ম পালন করছে যা মূলতঃ আল্লাহ'র কাছ থেকেই এসেছিল।

তাওরাত ও ইনজিল আল্লাহ'র পাঠানো কিতাব যদিও পরে সময়ের সাথে সাথে এগুলি বদলে যায়। আল্লাহ জানান, মানবজাতির কাছে কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে এসেছে। এই বই আগেকার কিতাবগুলির সমর্থনকারী।

নিচের আয়াতে আল্লাহ বনী ইসরাইলদের উদ্দেশ্যে বলেন

"আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তাতে ঈমান আনো যা তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সত্যায়নকারী। কিতাব অস্বীকারকারীদের মধ্যে তোমরা প্রথম হয়ো না ও তুচ্ছ মূল্যের বদলে আমার আয়াত বিক্রি করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।"

[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ৪১]

তাওরাত ও ইনজিলে একজন নিরক্ষর নবীর আসার কথা বলা হয়েছিল। তাই এসব বইয়ের পণ্ডিতরা নবীর (দঃ) আগমন সম্পর্কে জানতেন ও কুরআন যে স্রষ্টার সর্বশেষ কিতাব – সেটাও তাদের জানা ছিল।

"আগেকার মানুষদের কাছে আসা কিতাবগুলিতে অবশ্যই এ (কুরআন) সম্পর্কে বলা আছে। তাদের জন্য এ কি এক নিদর্শন নয় যে বনী ইসরাইলের পণ্ডিতরা এ সম্পর্কে জানে ?" *[সূরা শু' আরা ; ২৬ ঃ ১৯৬-১৯৭]*

বিশিষ্ট তফসীরবিদ ইমাম সৈয়দ হাওয়া তাঁর আল আসাস ফিত তাফসীর বইতে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– এটা নিশ্চিত যে আগেকার কিতাবগুলিতে কুরআনের অস্তিত্ব আছে। অন্য কথায়, আগের ধর্মীয় বইগুলিতে কুরআনের উল্লেখ আছে।

আগের নবীগণ তাঁদের জাতির কাছে যে বার্তা পৌঁছে দেন তা আল্লাহ'রই বাণী।

মধ্যপন্থী ও সৎ ইয়াহুদী পণ্ডিতেরা জানতেন তাওরাত, জাবুর ও ইনজিলে কুরআনের কথাগুলিই আছে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে কুরআনই হলো সর্বশেষ কিতাব ও এর প্রতিটি বাণী আল্লাহ'র কাছ থেকে আসা সত্য।

তারা চিনতে পেরেছিলেন যে আগের কিতাবগুলি যার কথা বলেছে, ইনিই সেই শেষ রাসূল (দঃ) (টীকা ১৫)।

রাসূল (দঃ)-এর আবির্ভাবের পর অনেক রাব্বি ও যাজকরা (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মগুরু) সাথে সাথেই চিনে নেন যে এই সেই নিরক্ষর নবী – তাদের আসমানী কিতাবগুলিতে যার সম্পর্কে ভবিষ্যতে বাণী করা হয়েছে।

রাসূল (দঃ) ওহীর মাধ্যমে তাওরাত, ইনজিল ও বনী ইসরাইলের ইতিহাস জানতেন। কুরআনে সূরা বাকারায় এ নিয়ে বলা হয়েছে।

"হে বনী ইসরাইল! তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের কথা মনে করো। আমাকে যে কথা দিয়েছিলে তা পূরণ করো, আমিও তোমাদেরকে দেয়া আমার কথা রক্ষা করবো। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তাতে ঈমান আনো যা তোমাদের কিতাবের সত্যায়নকারী। তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না ও তুচ্ছ মূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না। শুধু আমাকেই ভয় করো। সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে ফেলো না ও জেনে-শুনে সত্যকে লুকিয়ে রেখো না।

[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ৪০-৪২]

রাসূল (দঃ) যখন তাদেরকে কুরআনের এই আয়াতগুলি শোনালেন, তখন ইসরাইলীদের জ্ঞানী মানুষরা তাদের বহু প্রতীক্ষিত নবীকে চিনতে পারেন। আসমানী কিতাবের মানুষেরা দেখলেন ইনিই স্রষ্টার রাসূল (দঃ) ও সবসময়ই ইনি সত্যি বলছেন। রাসূল (দঃ)-এর স্বভাব ও জীবন-যাপন সবাইকে বুঝিয়ে দেয় ইনিই সেই নবী তাওরাত ও ইনজিলে যার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ "যারা উম্মী রাসূলকে মেনে চলে যার উল্লেখ তারা পেয়েছে তাওরাত ও ইনজিলে, যিনি তাদেরকে ভাল কাজ করতে বলেন ও খারাপ কাজে নিষেধ করেন, পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র বিষয়কে হারাম করেন ; যিনি তাদের ভারী বোঝা ও শৃঙ্খল (অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্তি হিসেবে ইয়াহুদীদের উপর যে কঠিন বিধি-বিধান ছিল অথবা শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতা) থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

"যারা এই রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান ও সাহায্য করে এবং তাঁর কাছে পাঠানো নূরের অনুসরণ করে– তারাই সফল।"

[সূরা আরাফ ; ৭ ঃ ১৫৭]

ইসলামী পণ্ডিত ওমর নাসুতি বিলমান তার কুরআনের তফসির বইতে বলেনঃ এই আয়াত প্রকাশ করে যে যারা শেষ নবীর (দঃ) অনুসারী, তারা বিভিন্ন সৎ গুণের অধিকারী, ভাল ভাল কাজ করে এবং এই দুনিয়া ও পরকালের উত্তম পুরস্কার তারা লাভ করবে।

যে নবী (দঃ) কখনো কিছু পড়েন নি বা লেখেন নি – তার উপরই নাজিল হয়েছে আসমানী কিতাব – যাতে রয়েছে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান – যারা এই রাসূল (দঃ)-কে মেনে নেয় ও অনুসরণ করে, তারা রাসূল (দঃ)-এর দলভুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করে। তাওরাত ও ইনজিলে শেষ নবীর (দঃ) নাম বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে রাসূল (দঃ)-এর নাম ও বৈশিষ্ট্যের কথা আসমানী কিতাবগুলিতে বলা হয়েছে। না হলে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এমন দাবি নিশ্চয়ই করতেন না। তাছাড়া তাঁর এই দাবি প্রত্যাখান করার সুযোগও অমুসলিমরা তখন পেয়ে যেত। তিনি এমন একজন মহান রাসূল ছিলেন যিনি মানবজাতিকে উপদেশ দিতেন সত্যের পথে আসতে, এক আল্লাহ'র নির্দেশ মান্য করতে, যথার্থ বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অর্জন করতে এবং আল্লাহ'র সৃষ্টিকে দয়া করতে বলতেন (এবং অন্যায় করতে নিষেধ করতেন)। (টীকা ১৬)

শেষনবী (দঃ) সম্পর্কে যে ভবিষ্যত বাণী আসমানী কিতাবের মানুষের কাছে করা হয়েছিল, এটা রাসূল (দঃ) সম্পর্কিত মুযেজা। বিভিন্ন জিনিস প্রত্যক্ষ করে এই কিতাবীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায়, তারা এই সত্যকে নিশ্চিত করে।

৬. হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর জীবনের কিছু মুযেজা

আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সারা জীবনভর রাসূল (দঃ)-কে অনেক মুযেজা দান করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কুরআন নাজিল হওয়া ও কুরআন নিজেই সব মুযেজার সেরা। রাসূল (দঃ)-এর অসাধারণ চরিত্র, তার কাজ এমনকি হাদীসও মুযেজা। এছাড়া আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা রাসূল (দঃ)-এর জীবনে ঘটেছে যার কথা কুরআন ও রাসূলের জীবনীতে বলা হয়েছে।

নিচে অল্প কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হলো
রাতের অভিযান ও আকাশ ভ্রমণ (শবেমেরাজ)

রাসূল (দঃ)-এর জীবনে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো শবেমেরাজ। এটি হিজরতের এক বছর সাত মাস আগে ঘটে। কুরআনের সূরা ইসরার প্রথম আয়াতে শবে মেরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে রাত্রিতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করান যার চারদিক আমি করেছি বরকতময়, তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন।

[সূরা ইসরা ; ১৭ ঃ ১]

হাদীসে বলা হয়েছে,রাসূল (দঃ) কাবার পাশে ঘুমাচ্ছিলেন। তখন জিবরাইল (আঃ) তাঁর কাছে আসে ও একটি সাদা প্রাণী (গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি) বোরাকের উপর তাঁকে বসান। এরপর রাসূল (দঃ) বোরাকে চড়ে মক্কার মসজিদ-উল-হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদ-উল-আকসায় যান) আকসা শব্দের অর্থ দূরবর্তী)।

এই দুই মসজিদের মধ্যে দূরত্ব ১২৩৫ কিলোমিটার। মসজিদ-উল-আকসা থেকে রাসূল (দঃ) তাঁর রাত্রিকালীন অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেন। সপ্ত আসমান ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা (মহাকাশের সর্বোচ্চ সীমার কূল গাছের) কাছে ও এরপরে মহান স্রষ্টার কাছে তিনি যান। ইবনে কাসির বলেন, কমপক্ষে

২৫ জন সাহাবী শবেমেরাজের কাহিনী রাসূল (দঃ)-এর কাছ থেকে শুনেন। এই সংখ্যা ৪৫ জনও হতে পারে।

যাদের বর্ণনা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা হয় তারা হলেন, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরায়রা, আবু সৈয়দ আল খুদরী, মালিক ইবনে সাসা, আবু দার আল গিফারী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ এবং উম্মে হানী।

হাদিসে বিস্তারিত বলা হয়েছে, রাসূল (দঃ) মেরাজে গিয়ে কী দেখেছিলেন। আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনায় মুসলিম শরীফ থেকে মেরাজে কী কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমরা জেনেছি। জিবরাইল (আঃ)-এর সাথে রাসূল (দঃ) আসমান ভেদ করে আল্লাহ'র কাছে যাওয়ার সময় বিভিন্ন নবী ও রাসূল (দঃ)-এর দেখা পান। এরা হলেন আদম, ঈসা, ইয়াহিয়া, ইউসুফ, ইদরিস, হারুন, মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)।

এরপর রাসূল (দঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছান ও ওহী লাভ করেন, "রাসূল বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে যা ওহী এসেছে তাতে ও মুসলমানেরাও। তাঁরা বিশ্বাস রাখে আল্লাহ, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব ও আল্লাহ'র রাসূলদের উপর। তাঁরা বলে, আমরা রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি ও কবুল করেছি। আমরা আপনার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। আপনার কাছেই আমরা ফিরে যাবো।"

[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ২৮৫]

এরপর রাসূল (দঃ) আল্লাহ'র কাছে যান ও সেখানেই তিনি আদেশ লাভ করেন যে মুসলমানরা এখন থেকে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। আকাশে সিদরাতুল মুনতাহায় রাসূল (দঃ)-এর যাওয়া নিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয়ই সে [মুহাম্মাদ (দঃ)] তাকে [জিবরাইল (আঃ)]-কে আরেকবার দেখেছিলো শেষ সীমানার কুল গাছের কাছে ; যার পাশে আছে জান্নাত ; যা দিয়ে ঢাকা থাকার কথা (অর্থাৎ আল্লাহ'র নূর) দিয়ে কুল গাছটি ঢাকা ছিল ; তাঁর দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটেনি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। সে তাঁর প্রভুর কিছু সেরা নিদর্শন দেখেছে।

[সূরা নাজম ; ৫৩ ঃ ১৩-১৮]

ফিরে আসার পর রাসূল (দঃ) কুরাইশদের বললেন গত রাতে কী ঘটেছে। অবিশ্বাসীরা এমন কী কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলমানরাও রাসূল (দঃ)-এর মুযেজায় অবিশ্বাস করলো। তারা আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে রাসূল (দঃ)-এর নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনলো। আবু বকর (রাঃ)-কে কাফিররা

প্রশ্ন করলো শবেমেরাজের ঘটনা তিনি সত্য বলে মানেন কী না ও রাসূল (দঃ)-কে তিনি এখনো বিশ্বাস করেন কি না ? জবাবে আবু বকর (রাঃ) জানান, যদি রাসূল (দঃ) এটা বলে থাকেন, তাহলে হ্যাঁ, আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।

আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)-এর প্রতি এই বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের জন্য তাকে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) সিদ্দিক (সম্পূর্ণ বিশ্বাসী) উপাধি দেন।

কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-কে নানা প্রশ্ন করে জানার জন্য যে তিনি সত্যি না মিথ্যা বলছেন। রাসূল (দঃ) তাঁদের সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন। হাদীসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। তারা জানতে চায় ; মসজিদ-উল-আকসা দেখতে কেমন ? এদের মধ্যে কেউ কেউ জেরুজালেম সফর করেছিল ও এই মসজিদ দেখেছিল।

রাসূল (দঃ) পরে বলেন, "আমি যখন তাদেরকে মসজিদের বর্ণনা দিচ্ছিলাম, মনে দ্বিধা- সন্দেহ দেখা দেয়। তখন মসজিদ-উল-আকসাকে নিয়ে আসা হয় ও ইকাল বা আকিলের বাসার সামনে এনে রাখা হয়। আমি তখন ঐ মসজিদের দিকে তাকিয়ে বর্ণনা দিতে থাকি।"

রাসূল (দঃ)-এর বর্ণনা শেষ হলে তারা বলে, খোদার কসম, এই উত্তর সঠিক (ইমাম আহমদ, মুসনাদ)

"আমার মনে আছে কুরাইশরা জানতে চাচ্ছিলো শবে মেরাজ সম্পর্কে। তারা প্রশ্ন করে বায়তুল মকদিস সম্পর্কে। আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না– তখন আল্লাহ আমাকে দেখানোর জন্য বায়তুল মকদিসকে উপরে তুলে ধরেন। তখন কুরাইশরা যে প্রশ্নই করলো, আমি উত্তর দিতে পারলাম। (টীকা ১৭)

বলাবাহুল্য, এরপরেও কাফিররা রাসূল (দঃ)-এর মেরাজকে অস্বীকার করলো ও প্রমাণ চাইলো। আল্লাহ'র সাহায্যে রাসূল (দঃ) তাদেরকে প্রমাণ দিলেন – যা তারা অস্বীকার করতে পারলো না।

তারা জানতে চেয়েছিল মেরাজের কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে ? রাসূল (দঃ) উত্তরে বলেন, "কুরাইশদের একটি মরুযাত্রী দলের দেখা পাই আমি। এটা ছিল অমুক জায়গায়। ঐ দল আমাদেরকে দেখে ভয় পেয়েছিল এবং পথ বদল করে। ঐ দলের উটের পিঠে সাদা ও কালো বস্তা আছে। ঐ উটটি ভয়ে চিৎকার করে ও পড়ে যায়।" পরে যখন ঐ যাত্রী দল এসে পৌঁছায়, তখন কুরাইশরা তাদেরকে ঐ রাত্রের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করে। তারা উত্তরে তাই বলে যা রাসূল (দঃ) বলেছিলেন। (টীকা ১৮)

রাতের ভ্রমণ ও আকাশে যাওয়া (ইসরা ওয়াল মেরাজ) রাসূল (দঃ)-এর অন্যতম সেরা মুযেজা যা তাঁর বার্তাকে শক্তিশালী করে। মেরাজের ঘটনা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কাফিররা সন্দেহ নিয়ে যত প্রশ্ন রাসূল (দঃ)-কে করেছিল, আল্লাহ সে সবের উত্তর দিতে তাঁকে সাহায্য করেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে রাসূল (দঃ) সত্যবাদী।

আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ)-এর জন্য চাঁদকে দুই টুকরো করেন –

আরেকটি অসাধারণ মুযেজা যা রাসূল (দঃ)-কে দান করা হয় তাহলো, চাঁদকে দুই টুকরো করা। কুরআনে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে সূরা কামারে– "কেয়ামতের সময় কাছেই এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।" (৫৪ ঃ ১)

কুরআনে 'এবং চাঁদ বিদীর্ণ হলো' ... এই আয়াতে দুটি শব্দ বিদীর্ণ ও চাঁদ ব্যবহৃত হয়েছে (ওয়াল সাকা আল কামার)।

বিদীর্ণ শব্দের মূল অর্থ ভাগ করা/পৃথক করা/বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি। চাষ করার পর যখন মাটি ভেদ করে শস্য জন্মায় ... এই অর্থে এটির মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই বিদীর্ণ শব্দকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ... পৃথক হওয়া/খণ্ডে খণ্ডে টুকরো হওয়া/আলাদা হওয়া ইত্যাদি।

চাঁদ ভাগ হওয়ার ঘটনা হাদীসের বিখ্যাত সংকলকদের বইতে আছে। এরা হলেন, ইমাম আল বুখারী, ইমাম মুসলিম, আত তিরমিযী, আহমেদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ, আল হাকিম, আল বায়হাকী ও আবু নাউম (টীকা ১৯)

এ বিষয়ে কিছু নির্বাচিত হাদীস নিচে দেয়া হলো ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন, চাঁদ যখন দুই টুকরো হয়, তখন আমরা মীনাতে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)-এর সাথে ছিলাম। চাঁদের এক টুকরো পাহাড়ের পিছনে, অন্য টুকরো পাহাড়ের অন্য পাশে চলে যায়। আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো (মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ জানান, আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)-এর সময়ে চাঁদ বিদীর্ণ হয়। পাহাড় চাঁদের এক টুকরোকে ঢেকে রাখে, অন্য অংশ পাহাড়ের উপরে দেখা যায়। আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) বলেন ; তোমরা সাক্ষী থাকো (মুসলিম)।

আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)-এর সময়ে চাঁদ দুই টুকরো হয়। চাঁদের এক অংশ পাহাড়ের উপরে, অন্য টুকরো পাহাড়ের পিছনে চলে যায়। তখন আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) বলেন, এই মুযেজা দেখো (বুখারী)।

মক্কার লোকেরা আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)-এর কাছে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে চাচ্ছিলো। আল্লাহ'র অনুমতিতে রাসূল (দঃ) তাদেরকে চাঁদ টুকরো করে দেখান।

মক্কার লোকেরা রাসূল (দঃ) কে মুযেজা দেখাতে বলে। তাই দুইবার তিনি চাঁদকে ভাগ করেন (মুসলিম)। স্পষ্ট মুযেজা দেখার পরেও মূর্তি পূজারী কুরাইশরা রাসূল (দঃ) কে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। তারা যা দেখেছে তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই তারা অভিযোগ করে যে এটা একটা জাদু।

"তারা কোঁন নিদর্শন দেখলে অন্যদিকে ফিরে যায়, বলে ঃ এতো সেই আগেকার জাদু। তারা সত্যকে অস্বীকার করে ও নিজেদের খেয়াল ও ইচ্ছামতো চলে ; সব কিছুরই জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে।" *[সূরা কামার ; ৫৪ ঃ ২-৩]*

"... আমাদের দৃষ্টি বিভ্রাট হয়েছে অথবা আমাদেরকে জাদুমন্ত্র করা হয়েছে।" *[সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৫]*

বদিউজ্জামান সৈয়দ নূরসী জানান, এই মুযেজা অনেক সাহাবী দেখেছেন। তিনি বলেন, মূর্তি পূজারীরা এই মুযেজার সময় একেবারে অসহায়, শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

রাসূল (দঃ)-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুযেজাগুলির মধ্যে এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতির (বংশ পরম্পরা অনেক মানুষ যে ঘটনা জেনেছে ও অন্যকে বলেছে। এই ঘটনায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই)। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় বলে যার সত্যতা সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত। বিভিন্ন সাহাবী এই মুযেজার কথা বলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ইবনে মাসুদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আলী, আনাস ও হুদায়ফা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কুরআন পুরো বিশ্বকে জানাচ্ছে প্রধান একটি মুযেজার কথা। *[সূরা কামার ; ৫৪ ঃ ১]*

এমন কী, ঐ সময়ের সবচেয়ে একগুঁয়ে কাফিররাও এই আয়াতকে অস্বীকার করতে পারে নি। তারা শুধু এটাই বলতে পেরেছিল, এটা জাদু। কাফিররাও জানতো যে চাঁদ টুকরো হয়েছে। (টীকা ২০)

নূরসী এই মুযেজার অতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় আরো বলেন

মুযেজা ঘটে নবুয়তের প্রমাণ দিতে ও কাফিরদের বিশ্বাস করানোর জন্য –কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করার জন্য নয়।

এই মুযেজার দরকার ছিল তাদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য যারা মুহাম্মাদ (দঃ)-এর নবুয়ত লাভের কথা শুনেছে। এই মুযেজা দুনিয়ার সব এলাকা থেকে দেখতে পাওয়া বা এমনভাবে সবাইকে দেখানো যাতে কেউ এই ঘটনা অস্বীকার না করতে পারে– এমনটি হলে তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ'র প্রজ্ঞা ও যে কারণে মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, তার সাথে খাপ খেতো না। মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন, ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন।

বস্তুবাদী দার্শনিকরা যেমনটি বলে থাকে, সেরকমভাবে চাঁদকে খণ্ডিত অবস্থায় কয়েক ঘন্টা রেখে সারা দুনিয়ার মানুষকে দেখালে এবং তা সব ঐতিহাসিকদের রেকর্ড থাকলে ঐ ঘটনা হয়তো জ্যোতির্বিদ্যায় অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পেত।

এটা আর রাসূল (দঃ)-এর মুযেজা থাকতো না বা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হতো না ; অথবা হয়তো তখন এটাকে এমন এক মুযেজা হিসাবে মানুষ দেখতো যাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে না পেরে তারা এটা মানতে বাধ্য হতো– তাদেরকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ দিয়েছেন, তার প্রয়োগ আর তারা ঘটাতে পারতো না। ফলে কয়লা ও হীরা [আবু জাহল ও আবু বকর (রাঃ)] সব এক কাতারে চলে আসতো। দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য নষ্ট হতো। (টীকা ২১)

রাসূল (দঃ)-কে গাছ উত্তর দিলো

গাছ কিভাবে রাসূল (দঃ)-এর কথা শুনলো ও উত্তর দিলো সে নিয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন, এক লজ্জাবতী গাছ রাসূল (দঃ)-এর কথায় সাড়া দিয়ে বলে উঠে– আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ (দঃ) তাঁর রাসূল।

ইবনে উমর বলেন, আমরা রাসূল (দঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক বেদুইন রাসূল (দঃ) কে দেখে কাছে আসলে তিনি জানতে চান ঃ বেদুইন, তুমি কোথায় যাচ্ছো ? লোকটি বলে ঃ আমার পরিবারের কাছে। রাসূল (দঃ) বললেন, তুমি কি ভাল কিছু চাও ?

বেদুইন জানতে চাইলো– সেটা কী ? রাসূল (দঃ) বললেন ঃ তা হলো এই – তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে কোন মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া যার কোন শরীক নেই ও মুহাম্মাদ (দঃ) আল্লাহ'র দাস ও রাসূল।

বেদুইন বললো, আপনি যে সত্য বলছেন তার সাক্ষ্য কে দেবে ? রাসূল (দঃ) তখন বললেন– ঐ লজ্জাবতী গাছটি সাক্ষ্য দেবে। গাছটি তখন নদীর তীর

থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো যতক্ষণ না রাসূল (দঃ)-এর একদম সামনে আসলো। রাসূল (দঃ) গাছকে বললেন তিনবার সাক্ষ্য দিতে ও গাছটি ঠিক তাই করলো, তারপর নিজ জায়গায় ফিরে গেল (আদ দারিসী, আল বায়হাকী ও আল বাযযার)। (টীকা ২২)

এমনকি, জড় পদার্থ পাথরও রাসূল (দঃ) কে অভিবাদন জানায় ও সাক্ষ্য দেয় যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আলী ও অন্যরা বললেন ঃ রাসূল (দঃ)-এর সাথে মক্কার সীমান্তে আমি হাঁটছিলাম। আমি দেখলাম রাসূল (দঃ) যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সব গাছ ও পাথরই বলছিলো, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) (আল তিরমিযী)।

আল্লাহ'র অনুমতিতে গাছ সরে যায় রাসূল (দঃ)-এর সুবিধার জন্য। এ ধরনের অনেক ঘটনার মধ্যে একটি হলো– ইবনে ফারুক জানান যে তায়েফে সামরিক অভিযানের সময় রাসূল (দঃ) রাতে সফর করছিলেন ও একসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তখন তার চলার পথে পড়া একটি লট গাছ দুই ভাগ হয়ে যায় ও রাসূল (দঃ) ঐ গাছের ফাঁক দিয়ে চলে যান। গাছটি দুই ভাগ অবস্থায় সারাদিন ছিল। এটা অনেকেই জানে– (টীকা ২৩)।

এই কাহিনী অনেকেরই জানা আছে যে রাসূল (দঃ) খুতবা দেয়ার সময় একটি খেজুর গাছে ভর দিতেন। যখন মসজিদের মিম্বার তৈরি হলো ও খেজুর গাছটির আর দরকার থাকলো না, তখন গাছটি কষ্টে আর্তনাদ করতে থাকে ও রাসূল (দঃ)-এর প্রতি ভালবাসায় কাঁদতে থাকে।

জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মসজিদ বানানো হয়েছিল অনেকগুলি খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে। মসজিদে আসা মানুষদের সাথে কথা বলার সময় এই গুঁড়িগুলির একটির উপর রাসূল (দঃ) ভর দিতেন। যখন রাসূল (দঃ)-এর জন্য মিম্বর তৈরি হলো, তখন আমরা শুনলাম গুঁড়িটি আওয়াজ করছে ঠিক যেন উটের মতো। (বুখারী) (টীকা ২৪)

অফুরন্ত পানি ও খাবার

আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ) কে সারা জীবন ধরেই নানাভাবে রহমত দান করেছেন। রাসূল (দঃ) স্পর্শ করেছেন বা দোয়া করেছেন এমন কিছুতে আল্লাহ'র রহমতে বরকত বাড়তো।

হাদীসে এমন ঘটনার কথা বলা আছে। যখন দেখা যাচ্ছিলো পানি ও খাবার খুবই কম, তখন রাসূল (দঃ)-এর উপস্থিতিতে অফুরন্ত পানি ও খাবার পাওয়া

যায়। একবার পানি এত কম ছিল যে সাহাবীরা ওজুও করতে পারছিলেন না। রাসূল (দঃ) কে আল্লাহ মুযেজা দান করলেন। ফলে সেই পানিতেই অসংখ্য মানুষ ওজু করলেন।

আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ আসরের নামাজের সময় আমি রাসূল (দঃ) কে দেখলাম। ঐ সময় মানুষ ওজুর জন্য পানি চাচ্ছিলো কিন্তু কোথাও পানি খুঁজে পেল না। তখন আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) নিজের হাত সামান্য পানির পাত্রে রাখলেন। এরপর তিনি সবাইকে বললেন ঐ পাত্র থেকে পানি নিয়ে ওজু করতে। আনাস আরো বলেন, আমি দেখলাম রাসূল (দঃ)-এর আঙুল থেকে পানি বের হচ্ছে আর সবাই একে একে ওজু করলো।

[(মুসলিম, বুখারী) (টীকা ২৫)]

সহীহ হাদীসে অন্য একটি ঘটনার কথা আছে। আল হুদায়বিদায় ওজুর পানি পাওয়া যাচ্ছিলো না। রাসূল (দঃ) তখন পানির পাত্রে আঙুল ঢুকান। এরপর পনেরো হাজার লোক সেই পানি দিয়ে ওজু করে। (টীকা ২৬) (বর্ণনাকারী ঃ জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ)

রাসূল (দঃ)-এর দুই আঙুলের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার আরো কিছু ঘটনা জানা যায়। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এক সফরে মুসলিম বাহিনীর জন্য কোন পানি ছিল না। সকালে রাসূল (দঃ) কে একজন বললো, হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ), সেনাদলের কাছে কোন পানি নেই। রাসূল (দঃ) তখন জানতে চাইলেন, "অল্প একটু পানিও কি হবে না ?" হ্যাঁ। একটি পাত্রে তখনই অল্প পানি আনা হলো। রাসূল (দঃ) পাত্রের মুখে আঙুল প্রসারিত করলেন। পানি তাঁর আঙুল থেকে ঝর্ণার মতো প্রবাহিত হতে থাকলো।

রাসূল (দঃ) বেলালকে আদেশ দিলেন সবাইকে ডাকার জন্য– বরকতময় পানির কাছে আসো (ইবনে হাম্বলে, আল বায়হাকী, বাযযার, আত-তাবারানী ও আবু নায়ীম) (টীকা ২৭)

যিয়াদ ইবনে আল হারিথ আস সুদাই বলেন, রাসূল (দঃ) সফরে ছিলেন। সকাল হওয়ার আগে তিনি থামলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, হে সুদা গোষ্ঠির ভাই, পানি কি আছে ?

আমি বললাম, খুব অল্প পানি যা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না। তিনি আদেশ করলেন, একটি পাত্রে পানি ঢেলে আমার কাছে আনো। আমি পানি আনলাম। রাসূল (দঃ) তাঁর হাত পানিতে রাখলেন। আমি দেখলাম দুই

আঙুলের মধ্য দিয়ে ঝর্ণার মতো পানি বের হচ্ছে। রাসূল (দঃ) তখন আদেশ দিলেন ঃ যে সব সাহাবীদের পানির দরকার, তাদেরকে ডাকো। আমি ডাকলাম। যার যত পানি দরকার ছিল, তা সে নিতে পারলো।

আমরা বললাম, "হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)! আমাদের একটি কূপ আছে। শীতে সেখানে যথেষ্ট পানি থাকে, কিন্তু গরমের সময় আমরা কূপ থেকে পানি পাই না – পানির খোঁজে অন্য কোথাও যেতে হয়। আমরা এখন মুসলমান হয়েছি। আমাদের চারপাশে শত্রু। আপনি দয়া করে আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে এই কূপের পানি বেড়ে যায়। তাহলে আমাদেরকে আর পানির জন্য দূরে ঘোরাফেরা করতে হবে না। এই কূপের কাছেই আমরা তাহলে সবসময় থাকতে পারবো।"

রাসূল (দঃ) সাতটি পাথর আনার জন্য বললেন। তিনি হাতের মধ্যে পাথরের টুকরোগুলি ঘষলেন ও দোয়া করলেন। তারপর আদেশ দিলেন ঃ "এই পাথরগুলি নিয়ে যাও। কূপের মধ্যে আল্লাহ'র নাম নিয়ে এক এক করে পাথরগুলি ফেলে দাও।" আমরা তাই করলাম। এরপর আর কখনো আমরা কূপের নীচ দেখতে পারি নি (অর্থাৎ কূপ কখনো শুকিয়ে যায়নি– সবসময় তাতে পানি থাকতো।)

(আল হারিথ ইবনে উসামাহ– মুসনাদ গ্রন্থ : আল বায়হাকী ও আবু নায়ীম) –টীকা ২৮।

আরেকটি হাদীসে আছে রাসূল (দঃ) পা দিয়ে আঘাত করার পর ঐ জায়গা থেকে প্রচুর পানি বের হয়। আমর ইবনে শুয়াইব জানান, একবার রাসূল (দঃ)-এর সাথে তিনি যাচ্ছিলেন। তখন আবু তালিব বললেন, পিপাসা পেয়েছে কিন্তু আমার কাছে কোন পানি নেই। রাসূল (দঃ) তখন মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করলেন। মাটির নীচ থেকে পানি বের হতে থাকলো। রাসূল (দঃ) বললেন, পান করো। (টীকা ২৯)

একইভাবে সাহাবীরাও বলেছেন যে রাসূল (দঃ)-এর উপস্থিতিতে কখনোই পানি ও খাবার কম পড়তো না ও সবাই পেট ভরে খেতে পারতো। আনাস একটি ঘটনা বর্ণনা করেন ঃ " রাসূল (দঃ)-এর বিয়ের পর আমার আম্মা রাসূল (দঃ) ও তাঁর স্ত্রীর জন্য কয়েকটি খেজুর ও অল্প কিছু মাখন দিয়ে খাবার তৈরি করেন। আমি সেটা একটি পাত্রে করে নিয়ে যাই। রাসূল (দঃ) বলেন ঃ এটা নীচে রাখো ও অমুক অমুককে ও যার সাথে দেখা হয় তাকেই ডাকো।"

আমি সবাইকে দাওয়াত দিলাম ও সুফফাহ (মসজিদের নববী সংলগ্ন বারান্দা যেখানে গরীব মুসলমানরা ঘুমাতো) ও কামরা ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই ডাকতে বাদ দিলাম না। রাসূল (দঃ) নিজের সামনে পাত্রটি এনে তিনটি আঙুল খাবারের মধ্যে রাখলেন। মানুষ এসে খাওয়া শুরু করলো ও চলে গেল। পাত্রটি সেরকমই ভরা থাকলো যেমনটি প্রথমে ছিল। মানুষ ছিল ৭১ বা ৭২ জন (মুসলিম ও বুখারী) – টীকা ৩০।

একবার আবু আইউব শুধুমাত্র রাসূল (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ) খেতে পারবেন–এই পরিমাণ খাবার বানান। তিনি পরে বলেন, রাসূল (দঃ) তাকে আনসারদের মধ্য থেকে ত্রিশজনকে দাওয়াত দিতে বলেন। ঐ ত্রিশজন এসে খেয়ে চলে যাওয়ার পর রাসূল (দঃ) বললেন, আরো ষাটজনকে ডাকো। তারাও খেয়ে চলে যাওয়ার পর রাসূল (দঃ) বললেন আরো ৭০ জনকে ডাকো। এরপর তারা খাওয়ার পরেও বেশ কিছু খাবার রয়ে গেল।

রাসূল (দঃ) কে সম্মান প্রদর্শন ও মুসলমান না হয়ে এরা কেউ-ই চলে যায়নি। আবু আইউব বলেন, মোট ১৮০ জন ঐ খাবার খেয়েছিল (আল তাবারাণী ও আল বায়হাকী)– টীকা ৩১।

আবু হুরায়রা আরেকটি ঘটনা জানান, মসজিদে যত মানুষ ছিল সবাইকে রাসূল (দঃ) দাওয়াত দিতে বললেন। তিনি সবাইকে জড়ো করলেন ও একটি পাত্র রাখলেন সবার সামনে। সবই পেট ভরে খেয়ে চলে গেল। পাত্রে খাবার একই রকম রয়ে গেল– শুধু তার মধ্যে আঙুলের দাগ দেখা যাচ্ছিলো। টীকা ৩২

এসব উদাহরণ হলো অল্প কিছু মুযেজা যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ) কে দান করেন। রাসূল (দঃ)-এর জীবনে এমন কোন দিক নেই যা মুযেজা ছাড়া।

একেবারে অসাধারণ তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই এমন মুযেজা যেমন আকাশে ভ্রমণ, চাঁদ ভাগ করা ইত্যাদি থেকে শুরু করে প্রায় সময়ই সংঘটিত মুযেজা যেমন গাছের সালাম জানানো ইত্যাদি ঘটেছে রাসূল (দঃ)-এর জীবনে। এসব মুযেজা আল্লাহ'র বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করা, বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় করা ও কাফিরদের সত্য গ্রহণে দাওয়াত দেয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন। তাই মুযেজা দেখার পরেও সবাই তাতে বিশ্বাস আনেনি। রাসূল (দঃ) কখনোই দাবি করেন নি যে মুযেজা প্রদর্শনের ক্ষমতা তাঁর আছে। এসব আল্লাহ'র হুকুমে হয়েছে। রাসূল (দঃ) ছিলেন একজন বরকতময় মানুষ। তাঁর উপস্থিতিতে এত বরকত ছিল যে পানি ও খাবারের প্রাচুর্য দেখা দিতো। রাসূল (দঃ) মানুষের জন্য যে দোয়া করতেন তাতেও অনেক বরকত থাকতো।

৭. হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর দোয়ার বরকত

অন্যান্য নবী ও রাসূল (দঃ)-এর মতো হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর সাথেও আল্লাহ'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাসূল (দঃ) ছিলেন আল্লাহ'র বিশ্বস্ত দাস ও গভীর বিশ্বাস ও তাকওয়ায় অধিকারী। আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)-এর দোয়া কবুল করতেন। যার ফলে সাহাবী ও অন্য মানুষেরাও বিভিন্ন মুযেজা দেখতে পেতো। রাসূল (দঃ)-এর দোয়াতে অনেক বরকত ছিল। বিভিন্ন হাদীসে বলা আছে কিভাবে রাসূল (দঃ)-এর দোয়া কবুল হয়েছিল।

বৃষ্টির জন্য রাসূল (দঃ)-এর দোয়া (ইসতিসকা) যা আল্লাহ কবুল করেন ঃ

বৃষ্টির কল্যাণের জন্য রাসূল (দঃ) দোয়া করেন ও আল্লাহ কিভাবে তা কবুল করেন– হাদীসে এ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আনাস বলেন ঃ শুক্রবারে এক লোক মসজিদে আসে যখন রাসূল (দঃ) অন্যদের সাথে কথা বলছিলেন। সে বলে ঃ হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ), আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিবহন আমাদের নেই, আমাদের জন্য বৃষ্টি হওয়ার দোয়া করুন।" রাসূল (দঃ) হাত তুললেন ও দোয়া করলেন ঃ ও আল্লাহ ; আমাদেরকে বৃষ্টি দিন ; ও আল্লাহ ; আমাদেরকে বৃষ্টি দিন ; ও আল্লাহ ; আমাদেরকে বৃষ্টি দিন।

আল্লাহ'র কসম, ঐ সময় আকাশে কোন মেঘ ছিল না ও পাহাড় ও আমাদের মাঝে কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। পাহাড়ের পিছন থেকে ঢালের মতো দেখতে এক মেঘ ভেসে এলো। আকাশের মাঝ পর্যন্ত সেই মেঘ আসতে না আসতেই বৃষ্টি শুরু হলো। (বুখারী, মুসলিম)

আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ এক লোক রাসূল (দঃ)-এর কাছে এসে বলেঃ "হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) ; আমাদের জীবজন্তু মরে যাচ্ছে ; উট এত দুর্বল যে সফরে যেতে পারছে না। তাই আল্লাহ'র কাছে দোয়া করুন।" রাসূল (দঃ) দোয়া করলেন আর বৃষ্টি হলো এক জুম্মা থেকে পরের জুম্মাবার পর্যন্ত। (মুওয়াত্তা ঃ মালিক)

বৃষ্টি হয় ঐ শুক্রবার থেকে পরের শুক্রবার পর্যন্ত (বুখারী)।

রাসূল (দঃ)-এর দোয়ায় যে সাহাবীরা উপকার পেয়েছিলেন ঃ

রাসূল (দঃ) ছিলেন একজন স্নেহশীল ও সহানুভূমিসম্পন্ন মানুষ। তিনি সবসময়ই বিশ্বাসীদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন।

কুরআনে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে ঃ "তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখে তিনি কষ্ট পান ; তিনি তোমাদের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ; তিনি বিনয়ী ও বিশ্বাসীদের প্রতি ক্ষমাশীল।

[সূরা তওবা ; ৯ ঃ ১২৮]

হাদীসে আছে, সাহাবীদের সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ঈমান নিয়ে রাসূল (দঃ) তাদেরকে সবসময় নানা পরামর্শ দিতেন। তিনি দয়া ও সহানুভূতি নিয়ে সাহাবীদের কাছে যেতেন। আল্লাহ'র কাছে সাহাবীদের জন্য রাসূল (দঃ) অনেক দোয়া করতেন। বিশ্বাসীদের জন্য রাসূল (দঃ)-এর দোয়ার বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

"... এবং তুমি ওদের জন্য দোয়া করো ; তোমার দোয়া তাদের চিন্তা দূর করে। আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।" *[সূরা তওবা ; ৯ ঃ ১০৩]*

কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে রাসূল (দঃ) এর দোয়ার জন্য সাহাবীরা মনে শান্তি ও স্বস্তি পেত। হাদীসে আছে রাসূল (দঃ) কয়েকজন সাহাবীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুর জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। যেমন, ইবনে কাসির থেকে জানা যায়- রাসূল (দঃ) এর দোয়ার বরকতে কিছু সাহাবী তারুণ্যে ভরপুর ছিল।

আরো বলা আছে, যাদের দীর্ঘ আয়ুর জন্য রাসূল (দঃ) দোয়া করেন, তারা শত বছর বাঁচে। (টীকা ৩৩)

রাসূল (দঃ) একজন সাহাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ, একে সুন্দর করুন ও এই সৌন্দর্য্যকে দীর্ঘস্থায়ী করুন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই সাহাবীর মুখ ছিল সুন্দর তরুণের মতো। (টীকা ৩৪)।

রাসূল (দঃ) সাহাবীদের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্যও দোয়া করেছেন। আনাস বলেন ঃ রাসূল (দঃ) দোয়া করেন- "হে আল্লাহ ; তাঁকে (আনাসকে) সম্পদ, সন্তান ও রহমত দান করুন"। এরপর থেকে আনসারদের মধ্যে আমি সেরা ধনী ও আমার অনেক সন্তান (বুখারী, মুসলিম)।

আবদ উর রহমান ইবনে আউফকে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) বলেন- আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করুন। ইবনে সাদ ও আল বায়হাকী অন্য সূত্রে বলেন ঃ আবদ উর রহমান বলেন, আমি এত ধনী হলাম যে কোন পাথর তুললেও জানতাম আমি এ থেকে সোনা, রূপা পাবো (টীকা ৩৫)

আল বারাকীর জন্য রাসূল (দঃ) দোয়া করেন। সে এতটা স্বচ্ছলতা অর্জন করে যে সে জানতো মাটি বিক্রি করলেও তা থেকে তার আয় হবে (টীকা ৩৬)।

আবু উকাইল বলেন, তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম বাজারে যান গম কেনার জন্য। সেখানে ইবনে আয যুবায়ের ও ইবনে উমরের সাথে তার দেখা হয়। তারা বলেন, "আমাদের অংশীদার হও। কেননা, আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) তোমার প্রাচুর্য্যের জন্য দোয়া করেছেন"। দাদা তার গম থেকে ওদের সাথে ভাগাভাগি করলেন, এরপরও তার উটের বোঝা এতটুকু কমলো না। তিনি একই পরিমাণ গম নিয়েই বাড়ি ফিরলেন (টীকা ৩৭)।

৮. অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ) কে রক্ষা করেন

আমরা এর আগে জেনেছি যে, আল্লাহ'র বাণী প্রচার করার অনেক আগে থেকেই রাসূল (দঃ) সবার কাছে 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এটা তার সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দেয়। মক্কার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতো ও নিজেদের সমস্যায় হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর মহত্ব ও ন্যায়পরায়নতার জন্য তাঁকে বিচারক মানতো।

নবী (দঃ) ছিলেন বুদ্ধিমান, মুক্ত চিন্তার অধিকারী, সংবেদনশীল ও নিজ দায়িত্বের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও কাজে নির্ভুল। এসব গুণের কারণে তিনি সবারই সম্মান ও ভালবাসা লাভ করেন। অবশ্য যখন রাসূল (দঃ) সবাইকে এক আল্লাহ'র পথে ডাকলেন ও মূর্তি পূজা বাদ দিতে বললেন, তখন কাফিরদের অনেকেরই মনোভাব রাতারাতি বদলে গেল। ন্যায় ও সত্যের পথে ডাকার পর তারা কিভাবে রাসূল (দঃ) কে অপমানজনক উত্তর দেয়- কুরআনে তার উল্লেখ আছে :

"তারা বলে : এই যে তুমি, যার কাছে কুরআন এসেছে, তুমি অবশ্যই পাগল। তুমি যদি সত্যই বলে থাকো, তবে আমাদের কাছে ফিরিশতা আনো না কেন?" *[সূরা হিজর ; ১৫ : ৬-৭]*

রাসূল (দঃ)-কে অপবাদ দেয়া হয়, উপহাস করা হয় ও নানারকম মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অবস্থার মুখোমুখি হয়েও রাসূল (দঃ) শান্তভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। এই শিক্ষা মূর্তি পূজারীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও রাগের জন্ম দেয়। কেননা, সমাজে চালু থাকা বিভিন্ন মিথ্যা ধারণা, অবিচার ও নির্যাতনের এরা ছিল সুবিধাভোগী দল।

এরা ভয় পেল যে যদি ইসলাম সব জায়গায় চালু হয় তবে সমাজে তাদের এখন যে উঁচু মর্যাদা আছে এবং সে সুবিধা ও ধন-সম্পদ তারা ভোগ করেছে-

সেসব আর থাকবে না। রাসূল (দঃ) যে রহমত হিসাবে এসেছেন ও কী মূল্যবান শিক্ষা দিচ্ছেন- এটা কেবল সমাজের অল্প কিছু মানুষই বুঝতে পারলো।

রাসূল (দঃ) ও তাঁর অনুসারীদের কষ্ট দিতে ও তাঁদের জীবনকে দুর্বিসহ করতে মূর্তি উপাসকরা সব রকম চেষ্টা চালালো। মুসলমানদের একঘরে করা হলো, শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হলো এমন কী অনেককে মেরেও ফেলা হলো।

মক্কার লোকেরা এমন শত্রুতার মুখে রাসূল (দঃ) ও তাঁর অনুসারীরা মদীনায় হিযরত করতে বাধ্য হন।

মদীনার আনসাররা রাসূল (দঃ) ও অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে স্বাগতঃ জানায়। তবে ইয়াহুদীরা খুশীমনে স্বাগতঃ জানায় নি।

রাসূল (দঃ) এর চরিত্রের শক্তিমত্তার বড় প্রমাণ হলো তিনি কখনো বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন নি। মদীনায় রাসূল (দঃ) শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক ছিল মুনাফিকরা। তারা ভান করতো যে তারা বিশ্বাসী এবং রাসূল (দঃ) এর কাছে এসে তারা সময় কাটাতো। এরপর তারা কাফিরদের সাথে মিলে রাসূল (দঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

রাসূল (দঃ) যে সময় সংগ্রাম করছিলেন, তখন বিভিন্ন দল তাঁর প্রচন্ড বিরোধিতা করে। এই চরম শত্রুতার মুখে এটা একটা অলৌকিক ব্যপার যে উহুদের যুদ্ধে কয়েকটি দাঁত হারানো ও আহত হওয়া ছাড়া রাসূল (দঃ) এর আর তেমন কোন ক্ষতিই কখনো হয়নি।

কুরআনে আল্লাহ মানুষের ক্ষতি থেকে রাসূল (দঃ)-কে রক্ষার কথা

"....আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফিরদের হেদায়েত করেন না"। *[সূরা মায়িদাহ ; ৫ : ৬৭]*

বিভিন্ন মুযেজার মাধ্যমে আল্লাহ'র এই কথার বাস্তবায়ন ঘটে। কাফির, মূর্তি উপাসক ও মুনাফিকরা রাসূল (দঃ) এর ক্ষতি করতে চেষ্টা করতো। তারা রাসূল (দঃ) কে খুন করার চেষ্টাও করে কিন্তু সফল হয়নি। তাদের সব ষড়যন্ত্র, সব ফাঁদ ব্যর্থ হয়।

মুসলমানরা যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়, তখন আল্লাহ সবসময়ই রাসূল (দঃ) কে রক্ষা করেন ও বিশ্বাসীদের তাদের থেকে বড় ও শক্তিশালী কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। এর ফলে বিশ্বাসীদের ঈমান

দৃঢ় হয় ও অনেক অবিশ্বাসী ইসলাম কবুল করে। রাসূল (দঃ) লক্ষ্য পূরণে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। কুরআনে যেমনটি বলা হয়েছে- এটা একটা মুযেজা।

হাদীসে রাসূল (দঃ) সম্পর্কে এ বিষয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে।

কাফিররা মক্কায় রাসূল (দঃ)-কে মারতে পারে নি

ইসলামের প্রসারকে কাফিররা তাদের জন্য হুমকি মনে করতো, কেননা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও জাগতিক স্বার্থের ক্ষতি হবে। তারা দল বেঁধে আলোচনায় বসতো কিভাবে রাসূল (দঃ) কে প্রভাবিত করবে দীনের প্রচার বন্ধ করতে। এটা করতে না পেরে তারা ষড়যন্ত্র করে রাসূল (দঃ) কে খুন করার। আল্লাহ তাদের এসব ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন ও কুরআনে তা প্রকাশ করেন ঃ

"কাফিররা ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী, হত্যা অথবা বহিষ্কার করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেন। অবশ্যই আল্লাহ সেরা পরিকল্পনাকারী"। *[সূরা আনফাল ; ৮ ঃ ৩০]*

প্রথমে কাফিররা রাসূল (দঃ) কে জাগতিক বিষয়ের লোভ দেখায় যেমন সম্পদ ও ক্ষমতা। আল্লাহ'র বাণী আর প্রচার না করলেই তাঁকে পুরষ্কার হিসাবে এসব দেয়া হবে- উথবাহ এরকম একটি অশোভন প্রস্তাব রাসূল (দঃ) কে দেয়। ইবনে আবি সায়বাহ তার বই মাসনাদে এই প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন। উথবাহ বলে- আপনি যদি সম্পদ চান, তাহলে আমরা সবাই মিলে এত অর্থ সংগ্রহ করবো যে আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবেন।

যদি আপনি নেতৃত্ব চান, তাহলে আমরা আপনাকে নেতা হিসাবে মেনে নেব। আপনার মত ছাড়া কোন বিষয়েই আমরা কোন সিদ্ধান্ত নেব না। আপনি যদি রাজত্ব চান, তাহলে আমরা আপনাকে রাজমুকুট পরিয়ে আমাদের মাঝে রাজার সম্মান দেবো।

কাফিররা যেহেতু সম্পদ ও ক্ষমতাকে খুবই মূল্য দিতো, তারা ভেবেছিল তাদের এসব লোভনীয় প্রস্তাব রাসূল (দঃ) মেনে নেবেন।

"কাফিররা চায় তুমি আপস করো, তাহলে তারাও আপস করবে।
[সূরা কালাম ; ৬৮ ঃ ৯]

আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনকেই রাসূল (দঃ) যেহেতু গুরুত্ব দিতেন ও আল্লাহ'র কাছ থেকেই কেবল পুরষ্কার আশা করতেন, তিনি কাফিরদের সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দেন।

রাসূল (দঃ)-কে জাগতিক লোভ দেখিয়ে ইসলাম প্রচারে বিরত রাখতে না পেরে কাফিররা খুবই রেগে যায়। তারা তাকে বন্দী করার কথা ভাবে। ইবনে ইসহাক জানান, কুরাইশরা এক জায়গায় জড়ো হয় ও রাসূল (দঃ) সম্পর্কে একে অন্যকে বলে ঃ "তোমরা জানো এ কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে।" এই বলে তারা আলোচনা শুরু করে। একজন বলে ঃ আমরা তাকে কোথাও বন্দী করে রাখি। কারো সাথে তাঁকে কথা বলতে দেবো না। যতদিন মারা না যায়, ততদিন সে ওখানেই আটক থাকবে। ওকে আমরা খাবার দিবো যাতে সে বন্দীদশায় খেয়ে বাঁচতে পারে।

এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে কাফিররা একমত হতে পারলো না। এরপর তারা ঠিক করলো রাসূল (দঃ) কে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবও উপযুক্ত নয় বলে বাদ গেল। কেননা, তারা বুঝতে পারলো হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) তাঁর নিজ গোত্রের সমর্থন পাবেন। ঐ আরব গোষ্ঠী এই ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। হযরত (দঃ) এর এক চাচা আবু জাহেল ইসলামের চরম বিরোধী ছিল। সে প্রস্তাব দেয় সবচেয়ে ভাল হয় যদি মুহাম্মাদ (দঃ) কে একেবারে মেরে ফেলা হয়। (টীকা ৩৮)

আপন ভাতিজার প্রতি তার এতটাই ঘৃণা ছিল যে, রাসূল (দঃ) কে প্রাণে মারার কোন সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইলো না।

ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আল বুখারী বর্ণনা করেন ঃ আবু জাহেল বলে- আমি যদি দেখি মুহাম্মাদ (দঃ) কাবায় নামাজ পড়ছে, আমি তার ঘাড় পা দিয়ে চেপে ধরবো। রাসূল (দঃ) যখন এটা শুনলেন তখন বললেন ঃ সে যদি এটা করে, তবে ফিরিশতারা তাকে পাকড়াও করবে (বুখারী)। আবু জাহেল একটি বড় পাথর নিয়ে রাসূল (দঃ) কে মারার জন্য রওনা হয়। রাসূল (দঃ) সে সময় ইবাদাতে মগ্ন ছিলেন। রাসূল (দঃ) এর কাছে যাওয়ার আগেই আবু জাহেল ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে আসলো। তার হাত থেকে পাথর পড়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালিয়ে আসা সম্ভব- সে তাই করলো।

কুরাইশরা তার কাছে ছুটে গেল, জানতে চাইলো সে কেন দৌড়ে পালিয়ে আসলো ? আবু জাহেল জানায় ঃ এক ভয়ংকর উট আমার সামনে আসে ; উটটির মাথা, কাঁধ খুবই বড়, উটটির দাতগুলি ভয়ানক যেন আমি আর এগুলেই আমাকে কামড়ে খেয়ে ফেলবে। পরে রাসূল (দঃ) সাহাবীদের জানান উটটি আর কেউ নয় বরং জিবরাইল (আঃ)। যদি আবু জাহেল আর এগুতো তাহলে জিবরাইল (অঃ) তাকে মেরে ফেলতো (টীকা ৩৯)।

রাসূল (দঃ) যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখনো কাফিররা তাঁকে খুন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা সব গোষ্ঠির তরুণদের ডাকলো রাসূল (দঃ) কে খুন করার জন্য। তারা সবাই অস্ত্র হাতে রাসূল (দঃ) এর বাসার সামনে জড়ো হলো। খুনের পরিকল্পনা ছিল এমন যে সবাই একসাথে রাসূল (দঃ) এর উপর ঝাপিয়ে পড়বে ও আঘাত করবে। ফলে রাসূল (দঃ) কে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা দলের উপর পড়বে না। ফলে রাসূল (দঃ) এর গোত্র চাইলেও একা অন্য সব দলের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

জিবরাইল (আঃ) সেই রাতেই রাসূল (দঃ) এর কাছে আসেন ও নিজ বিছানায় না ঘুমাতে বলেন। রাসূল (দঃ) তখন আলী (রাঃ) কে বললেন ওখানে ঘুমাতে- তিনি জানতেন কুরাইশরা তাঁকেই খুন করতে চায়- আলীর (রাঃ) ক্ষতি তারা করবে না। রাসূল (দঃ) যখন ঘরের ভিতরে তখন সব দলের যুবকেরা এসে বাসার সামনে জড়ো হলো।

তাদের সামনে দিয়েই রাসূল (দঃ) যখন বাসা থেকে বের হলেন, তখন আল্লাহ তাদের দেখার শক্তি কেড়ে নেন- ফলে কেউ-ই দেখলো না যে রাসূল (দঃ) বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেন। যুবকেরা সারা রাত রাসূল (দঃ) এর বাড়ির সামনে পাহারা দিলো। সকালে তারা যখন দেখলো মুহাম্মাদ (দঃ) নয় বরং আলী (রাঃ) বের হলেন বাড়ি থেকে, তখন রাগে অস্থির হলো তারা। বুঝলো যে তাদের খুনের পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ। (টীকা ৪০)

রাসূল (দঃ)-কে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের গুহায় আল্লাহ'র মুযেজা

আলী (রাঃ) যখন রাসূল (দঃ) এর বিছানায় তখন রাসূল (দঃ) ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহচর আবু বকর (রাঃ) এর বাসায়। তাঁরা একসাথে মদীনায় রওনা হন।

রাসূল (দঃ) জানতেন মূর্তি উপাসকরা তাঁকে খুঁজবে। তাই মদীনায় যাওয়ার উত্তরের পথ বাদ দিয়ে তিনি বিপরীত দিকের পথ ধরলেন। এটা ছিল ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য মক্কার দক্ষিণের পথ। এই পথ ধরে ৬ কিলোমিটার হাঁটার পর তাঁরা সওর পাহাড়ে আসলেন। এটি ছিল খুব উঁচু পাহাড় ও উপরে উঠার জন্য বিপদজনক। রাসূল (দঃ) তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর (রাঃ) সহ এই পাহাড়ের এক গুহায় তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন। বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়, এই গুহার নাম আথহাল (টীকা ৪১)।

কুরাইশরা সব রাস্তা বন্ধ করে দিলো ও সশস্ত্র লোকদের নিয়োগ করলো রাসূল (দঃ) কে ধরার জন্য। ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে কাফিররা পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে রাসূল (দঃ) এর সন্ধান করতে থাকলে তারা পাহাড়ে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো। পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে অনুসন্ধানকারীরা রাসূল (দঃ) যে গুহায় লুকিয়ে ছিলেন, ঠিক সেখানেই হাজির হলো। এমন মুহূর্তে রাসূল (দঃ) তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আল্লাহ'র উপর রাখলেন। জীবনভর যা ঘটেছে, এখনও ঠিক সেভাবেই আল্লাহ'র ইচ্ছায় রাসূল (দঃ) অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন।

মক্কার পৌত্তলিকরা যখন রাসূল (দঃ) এর সন্ধানে গুহার মুখে সত্যিই পৌঁছেই গেল, তখন তারা দেখলো সেখানে মাকড়সা জাল বুনেছে ও কবুতর বাসা বানিয়ে ডিম পেড়েছে। তাই তারা ভাবলো এই গুহায় কোন মানুষ ঢুকে নি। কেননা, তাহলে মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা গুহার মুখে থাকতো না। তারা একেবারে গুহার মুখ থেকে ফিরে গেল।

এই ঘটনা আল্লাহ'র তরফ থেকে মুযেজা। আল্লাহ'র ইচ্ছাতেই মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে ও কবুতর বাসা বানায়। গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা রাসূল (দঃ) ও তাঁর সাথীর কোন ক্ষতি হলো না। এটা আল্লাহ'র মুযেজা যে অদৃশ্য শক্তি দিয়ে রাসূল (দঃ) কে সাহায্য করা হলো ও তাঁর মনে নিরাপত্তা ও স্বস্তি দান করা হলো। কুরআনে সূরা তওবাতে এর উল্লেখ আছে- "তোমরা রাসূলকে সাহায্য না করো, আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করেন যখন কাফিররা তাঁকে বাধ্য করে (মক্কা থেকে) চলে যেতে আর তারা দু'জন ছিল গুহাতে"। রাসূল তাঁর সাথীকে বলেন, হতাশ হয়ো না ; আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন। তখন আল্লাহ তাঁকে প্রশান্তি দান করলেন ও তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন বাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। তিনি কাফিরদের কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করেন। অবশ্যই আল্লাহ'র কথা সবার উপর প্রাধান্য পায়।

[সূরা তওবা - ৯ : ৪০]

তাফসীর ইবনে কাসীরে এই মুযেজার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে –

"তোমরা রাসূলকে সাহায্য না করো" .... এই আয়াতে আল্লাহ বলেন এতে কিছু যায় আসে না তোমরা রাসূলকে সাহায্য করোনি কেননা আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন "যখন কাফিররা তাঁকে বাধ্য করে (মক্কা থেকে) চলে যেতে আর তারা দু'জন ছিল গুহাতে"।

এই বহিস্কারের ঘটনা হলো মক্কা থেকে রাসূল (দঃ) এর মদীনায় হিযরত। পৌত্তলিকরা যখন রাসূল (দঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তখন তিনি সাথীসহ মক্কা ত্যাগ করেন। তারা দুজনেই সওর গুহায় তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন।

অসংখ্য শত্রু তাঁদের খোঁজে নিস্ফল ঘোরাফেরা করলো। আবু বকর (রাঃ) এক সময় ভয় পাচ্ছিলেন যে কাফিররা দেখে ফেলবে ও তাঁদের ক্ষতি করবে।

অবশ্য রাসূল (দঃ) আল্লাহ'র সাহায্যের নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ অবশ্যই তাঁদের রক্ষা করবেন। তাই তিনি আবু বকর (রাঃ) কে অভয় দেন।

আনাস থেকে ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেন ঃ আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল (দঃ)-এর সাথে গুহায় ছিলাম। তখন কাফিরদের দেখতে পেয়ে আমি বললাম, "হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)! যদি একজনও নিজের পায়ের নিচে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে দেখতে পারবে"। রাসূল (দঃ) জবাব দেন ; তুমি এমন দু'জন মানুষ সম্পর্কে কী ভাবো যাদের সাথে তৃতীয় সাথী হিসাবে আল্লাহতালা আছেন ? বুখারী ও মুসলিমও এই একই হাদীসের উল্লেখ করেন।

সেজন্য আল্লাহ বলেন, "তারপর আল্লাহ প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন।" আল্লাহ'ই রাসূল (দঃ) কে শান্তি, স্বস্তি ও সমর্থন দান করেন। "এবং তাঁকে শক্তি দান করলেন এমন এক বাহিনী দিয়ে যাদের তুমি দেখেনি"- এই বাহিনীর অর্থ ফিরিশতারা। "আল্লাহ কাফিরদের কথাকে নীচু করে দিলেন ও আল্লাহ'র কথা উপরে থাকলো"- ইবনে আব্বাস বলেন ঃ কাফিরদের কথা হলো আল্লাহ'র সাথে অংশীদারীত্ব ও আল্লাহ'র কথা হলো "নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া" (টীকা ৪২)।

আল্লাহ যুদ্ধের মধ্যে রাসূল (দঃ) ও বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য

২৩ বছর ধরে কুরআনের বাণী রাসূল (দঃ) এর কাছে নাজিল হয়। ওহী নাজিলের প্রথম তেরো বছর মুসলমানরা মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে সংখ্যালঘু হিসাবে ছিল ও অনেক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক মুসলমানকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়, অনেক মুসলমানকে মেরে ফেলা হয়। অনেকের ঘর-বাড়ি-সম্পদ লুট করা হয়। মুসলমানরা সবসময়ই অপমান ও হুমকীর মুখে থাকতো। এসব সত্ত্বেও মুসলমানরা সংঘর্ষের পথকে বেছে নেয়নি- সবসময়ই পৌত্তলিকদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত যখন মুশরিকদের নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন মুসলমানরা হিযরত করে ইয়াথরিব শহরে যান। [অনুবাদকের সংযোজন ঃ হযরত (দঃ) এই শহরে হিযরত করার পরে তাঁর প্রতি সম্মান দিখাতে এই শহরের নাম হয় মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর, সংক্ষেপে মদীনা।

সেখানে স্থানীয় জনগণ ও ইয়াহুদীদের সাথে থেকে মুসলমানরা নিজেদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। কাফিরদের কাছ থেকে আর কোন হুমকি এলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে অনুমতি দেন আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর মোকাবেলা করতে। কাফিররা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতো, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ) কে শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক মুযেজার মাধ্যমে সাহায্য করতেন- যেন রাসুল (দঃ) রক্ষা পান ও ইসলামের প্রসার ঘটান।

রাসূল (দঃ) ছিলেন সাহসী ও বীর পুরুষ যিনি যুদ্ধের ময়দানে নিজে অংশ নিতেন ও মুখোমুখি শত্রুর মোকাবেলা করতেন। যদিও তিনি যুদ্ধের ময়দানে সামনের দিকে থাকতেন, তাঁকে কেউ মেরে ফেলতে পারেনি। আল্লাহর তরফের এটা মুযেজা যে তিনি অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেন। আবু জাদান থেকে এই মুযেজার কথা বর্ণনা করেন ইবনে হাম্বাল, আত তাবারানী ও আবু নায়ীম। আমি রাসূল (দঃ) কে দেখলাম। একজন লোককে তাঁর সামনে আনা হলো। রাসূল (দঃ) কে বলা হলো- এই লোক আপনাকে খুন করতে চেয়েছিলো। এ শুনে রাসূল (দঃ) বললেন, তোমরা ভয় পেও না। ভয় পেও না। তোমরাও যদি চাইতে- আল্লাহ তা হতে দিতেন না। (টীকা ৪৩)

রাসূল (দঃ) যদিও জানতেন যে তিনিই কাফির ও মুনাফিকদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু, তিনি সবসময়ই বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। রাসূল (দঃ) জানতেন যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ'ই তাঁকে রক্ষা করবেন। তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ'র কাছে সমর্পণ করেন। তিনি আর কাউকে না বরং শুধু আল্লাহকেই ভয় পেতেন।

রাসূল (দঃ) ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন এমন একটি স্মরণীয় যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে পবিত্র রমজান মাসে এই যুদ্ধ হয়। আল্লাহ মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক মুযেজার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করেন- এমন কী তা যুদ্ধ শুরুর আগেই ঃ "যখন তোমরা ছিলে দুর্বল তখন আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেন ; তাই আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো"।

[সূরা ইমরান : ৩ ঃ ১২৩]

দুই পক্ষ যখন মুখোমুখি হয়, তখন দুই দলই একে অন্যের সৈন্য সংখ্যাকে কম দেখে। এই ঘটনা কুরআনে বলা হয়েছে সূরা আনফালে ঃ

"আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা খুবই কম দেখালেন। যদি বেশী সংখ্যায় দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারাতে ও যুদ্ধের ব্যাপারে মতবিরোধ করতে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচালেন। তিনি তোমাদের মনের খবর জানেন। যখন তোমরা মুখোমুখি হলে তখন তোমাদের চোখে তাদেরকে কম দেখালেন আর তাদের চোখেও তোমাদের সংখ্যা কম দেখালেন- যাতে আল্লাহ যা ঠিক করে রেখেছেন তাই ঘটে। সব কিছুই আল্লাহ'র কাছে ফিরে যায়"

[সূরা আনফাল ; ৮ ঃ ৪৩-৪৪]

আল্লাহ'র এই মুযেজার পিছনে গভীর জ্ঞান রয়েছে। মুসলমানরা যখন দেখলো তারা যা ভেবেছিল কাফিরদের সংখ্যা তার থেকে অনেক কম, তখন তা তাদের সাহস বাড়ালো ও মনোবল দৃঢ় করলো।

আবার কাফিররা যখন দেখলো মুসলমানরা সংখ্যায় একেবারেই কম, তখন তারা অসাবধান হয়ে পড়লো আর ভাবলো- সহজ জয়তো হাতের মুঠোয়।

ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- "সংখ্যায় কম ..." এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী দাসদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শণ করলেন।

আল্লাহ মুসলমানদের চোখে কাফির বাহিনীকে এত ছোট দেখালেন যা তাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে উৎসাহী করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন ঃ আল্লাহ কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা আমাদের চোখে এত কম করে দেখালেন যে আমি পাশের লোককে প্রশ্ন করলাম- ওরা সত্তরজন, তাই না ? সে বললো, না একশ' হবে।

আমরা তখন কুরাইশ বাহিনীর একজন লোককে ধরে জানতে চাইলাম তাদের সংখ্যা। সে বললো- আমরা এক হাজার যোদ্ধা। আল্লাহ'র ইচ্ছায় মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যেকার বিদ্বেষ যুদ্ধের ময়দানে বেড়ে গেল। একই সাথে একে অন্যের বাহিনীকে ক্ষুদ্র দেখতে পেয়ে যুদ্ধ করতে ভয় পেল না।- টীকা ৪৪ (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক আস সাবিল)।

বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। শক্তিশালী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগের রাতে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর দুশ্চিন্তা করা ছিল স্বাভাবিক। এমন ভীতিজনক রাত না ঘুমিয়েই সবাই পার করবে- এমনটিই ছিল স্বাভাবিক। অথচ দেখা গেল মুসলমান সৈন্যরা শান্তিতে, নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছেন।

ফলে যুদ্ধের দিন সকালে তারা সতেজ ও ধীর-স্থির মনে ঘুম থেকে উঠে। এটাও আল্লাহ'র তরফের এক মুযেজা ঃ

"তিনি তোমাদেরকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন, তোমাদেরকে নিরাপত্তার অনুভূতি দিলেন ..."। *[সূরা আনফাল ; ৮ ঃ ১১]*

এছাড়াও আল্লাহ মুসলমানদের উপর বৃষ্টি দিলেন। এর পিছনে গভীর জ্ঞান ছিল যা কুরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ "... তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি পাঠালেন তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাদের থেকে দূর করতে ; এবং তোমাদের মনকে সুরক্ষিত ও পা যেন মাটিতে দৃঢ় থাকে সেজন্য।"

[সূরা আনফাল ঃ ৮ ঃ ১১]

হালকা বৃষ্টি মুসলমানদের ক্লান্তি দূর করে তাদেরকে সতেজ করে তোলে। বৃষ্টির পানি মুসলমানরা পান করে ও সে পানিতে ওজু করে পবিত্র হয়। মুসলিম শিবির যেখানে ছিল, ঐ জায়গা ছিল ধূলা-বালিতে ভরা। সেজন্য সৈন্যদের সেখানে হাটতে কষ্ট হচ্ছিলো ও পা বালির ভিতরে দেবে যাচ্ছিলো। বৃষ্টির পানিতে ধুলিময় মাটি শক্ত হয়। ফলে মুসলমানদের জন্য হাঁটা-চলা করা সহজ হয় ও "তাঁদের পা দৃঢ় হয়"। এভাবে যুদ্ধ শুরুর আগেই মুসলমানদের মনোবল খুবই বেড়ে যায় ও মন শান্ত হয়।

যুদ্ধ যখন শুরু হলো, তখন রাসূল (দঃ) তাঁকে ও মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ'র কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ সাথে সাথেই রাসূল (দঃ) এর আবেদনে সাড়া দেন ও অনেক ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ও যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য।

"যখন তুমি তোমার প্রভুর কাছে সাহায্য চাইলে ও তিনি সাড়া দিলেন ঃ আমি তোমাকে সাহায্য করবো সারিবদ্ধ হাজার ফিরিশতা দিয়ে। আল্লাহ এটা করেন শুধুমাত্র তোমাকে সুখবর দেয়ার জন্য যাতে তোমার মন শান্তি লাভ করে। সাফল্য আসে শুধু আল্লাহ'র কাছ থেকেই আল্লাহ সব জানেন, সব শক্তির অধিকারী কেবল তিনিই"। *[সূরা আনফাল ; ৮ ঃ ৯-১০]*

ফিরিশতাদের সাহায্য সম্পর্কে আস সাবুনি তাঁর তফসীরে বলেন ঃ "আমি তোমাকে সাহায্য করবো সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে"- এই আয়াতে আল্লাহ জানান যে রাসূল (দঃ)-এর দোয়া তিনি কবুল করেছেন। তফসিরবিদরা বলেন হাদীসে আছে জিবরাইল (আঃ) পাঁচশ' ফিরিশতা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর ডানে থেকে যুদ্ধ করেন। মিকাইল (আঃ) ও পাঁচশত ফিরিশতা নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। এই ফিরিশতারা সেনাবাহিনীর বামে ছিল।

বদর ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ফিরিশতারা যুদ্ধে অংশ নেন কিনা, তা নিশ্চিত বলা যায় না। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যেন বেশী মনে হয়, সেজন্য অন্যান্য যুদ্ধে ফিরিশতারা ময়দানে উপস্থিত হতেন কিন্তু যুদ্ধে অংশ নিতেন না।

ওমর নাসুহী বিলমান আরো ব্যাখ্যা করেন ঃ রাসূল (দঃ) এভাবে দোয়া করেন ঃ

"প্রভু ! আপনার কথামতো আমাকে বিজয় দান করুন।" এরপরেই তিনি হালকা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হন ও তারপর হাসিমুখে জেগে ওঠেন। তিনি পাশে থাকা আবু বকর (রাঃ) কে বলেন ঃ সুখবর আবু বকর। জিবরাইল (আঃ) ও আরো অনেক ফিরিশতা আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে।" এরপর তিনি যুদ্ধের অস্ত্র, ঢাল এসব রেখেই তাবু থেকে বেরিয়ে আসেন। মুসলিম সৈন্যদের অনেকেই চিন্তিত ছিল শত্রুর সংখ্যা নিয়ে। তারা শুনলো আল্লাহ'র সাহায্য এসেছে ফিরিশতা পাঠানোর মধ্য দিয়ে। জানা যায় যে, তখন শক্তিশালী এক বায়ু প্রবাহিত হয় ও কেউ-ই কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। জিবরাইল (আঃ) ও আরো অনেক ফিরিশতা আসার এটি একটি চিহ্ন।

এই ফিরিশতারা সাদা ঘোড়ায় বসা ছিল। দেখতে সাদা ও হলুদ রংয়ের মানুষের মত দেখাচ্ছিলো এরা সশরীরে বদর যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে প্রথমে এক হাজার, এরপরই দুই ও তিন হাজার ফিরিশতা মুসলমানদের সাহায্য করতে আসে। পরে এই সংখ্যা বেড়ে পাঁচ হাজারে হয়। (টীকা ৪৫)

ফিরিশতাদের দিয়ে বিশ্বাসীদের সমর্থন দেয়ায় দ্বি-মুখী প্রভাব দেখা যায়। একদিকে এটা মুসলমানদের উপকারে আসে, অন্যদিকে তা শত্রুদের মনে ভয় সৃষ্টি করে। ইবনে কাসির বলেন ঃ আবু হুরায়রা জানায় রাসূল (দঃ) বলেন ঃ শত্রুর মনে ভয় ঢুকিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়। এছাড়া আমাকে দান করা হয়েছে সংক্ষেপিত সুস্পষ্ট বাণী (মুসলিম)- টীকা ৪৬।

বদর যুদ্ধের শুরুতে কাফিররা মুসলিমদের একদম অল্প সংখ্যায় দেখে। অথচ যুদ্ধ শুরুর পরে আসল সংখ্যা থেকেও অনেক বেশী করে সৈন্য তারা দেখতে থাকে।

"দুই দলের মোকাবেলায় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে ; এক দল আল্লাহ'র পথে লড়াই করছিলো, তাদের বিপক্ষে ছিল কাফিররা। মুসলমানদেরকে কাফিররা দ্বিগুণ সংখ্যায় দেখে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য পাঠিয়ে শক্তিশালী করেন। অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্য এতে নির্দেশ আছে"। *[সূরা ইমরান : ৩ ঃ ১৩]*

মুসলিমদেরকে নিজেদের সংখ্যার চেয়ে কাফিররা দ্বিগুণ সংখ্যায় দেখতে পায়। এটা ছিল আল্লাহ'র মুযেজা। এতে কাফিররা ভয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এভাবেও আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য ও কাফিরদের অপদস্থ করেন। অন্য যুদ্ধে ফিরিশতা পাঠানো হয় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, যাতে মুসলিম সৈন্য শত্রুর চোখে সংখ্যা ও শক্তিতে বেশী দেখায়।

হিজরতের অষ্টম বছরে সংঘটিত হুনায়ুন যুদ্ধের কথা কুরআনে বলা হয়েছে- "আল্লাহ তখন রাসূল ও মুমিনদের প্রশান্তি দান করেন ও এমন বাহিনী পাঠান যাদেরকে তোমরা দেখোনি ; তিনি কাফিরদের শাস্তি দেন ; কাফিরদের প্রতিফল এমনই"। *[সূরা তওবা : ৯ ঃ ২৬]*

রাসূল (দঃ) এর সময়ে মুসলমানরা আর একটি মুযেজার অভিজ্ঞতা পায়। তা হলো শত্রুপক্ষ যখন লড়াই শুরু করতো তখন মুসলমানরা ভীত বা দ্বিধাগ্রস্থ হতো না। কুরআনে আমাদের জানায় যে কাফিররা অনেক শক্তিশালী যোদ্ধা সংগ্রহ করতো মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য। সংখ্যায় কম মুসলমানদের উপর নির্যাতন করার চেষ্টা চালাতো শক্তিধর কাফির বাহিনী। এই অবস্থায় মুসলমানরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতো ও তাঁর উপরেই পূর্ণ আস্থা রাখতো।

আল্লাহ'র সমর্থন পাওয়ায় ও তাঁর হেফাযতে থাকায় মুসলমানরা নানাভাবে রহমতপ্রাপ্ত হতো ও নিরাপদে ফিরে আসতো। এর একটি উদাহরণ- আল্লাহ'র আরেকটি মুযেজা হলো যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা সাহসী ও দৃঢ় পদ থাকলে অনেক বেশী শত্রুর বিরুদ্ধেও তারা জয়ী হতো।

"হে নবী! মুমিনদের লড়াই করতে উৎসাহিত করো। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ থাকো, তবে দুইশ' জনকে হারাতে পারবে ; তোমাদের একশ' জন এক হাজার কাফিরদের হারাতে পারবে- কেননা ওরা এমন এক জাতি যাদের বোধশক্তি নেই।

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন- তিনি তোমাদের দুর্বলতা জানেন। তোমরা যদি অবিচলিত থাকো, তবে তোমাদের একশত'জন বিজয়ী হবে দুইশ' জনের বিপক্ষে ; যদি এক হাজার মুসলমান থাকে তবে আল্লাহ'র ইচ্ছায় দুই হাজারজনকে হারাতে পারবে। যারা দৃঢ় আস্থার পরিচয় দেয়, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন"। *[সূরা আনফাল ; ৮ ঃ ৬৫-৬৬]*

আল্লাহ কেন মুসলমানদের এত বেশী করে সাহায্য করেছেন, সে সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যায় সার-সংক্ষেপ করে বলা হয়েছে- মুসলমানদের ছিল তাকওয়া (আল্লাহ ভীরুতা) ও সবর (ধৈর্য)।

আল্লাহ কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে নিতে মানা করলেন ও কারণও জানিয়ে দিলেন। তিনি কথা দিলেন যে বিশ্বাসীরা যতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ও তাকওয়ার পরিচয় দেবে, আল্লাহ ততদিন কাফিরদের সব ষড়যন্ত্র ও ফাঁদ নিষ্ফল করে দেবেন। আল্লাহ দুইটি উদাহরণ দেন যখন তিনি বিশ্বাসী দাসদের অভিভাবক হিসাবে আবির্ভূত হন। একটি হলো উহুদ ও অন্যটি হলো বদরের যুদ্ধ। এই দুই যুদ্ধের দিনে বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন।

এই দুই যুদ্ধ বড় প্রমাণ কিভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক হিসাবে শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র ও শয়তানী চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। বিশ্বাসীদের সবর ও আল্লাহ ভীরুতার কথা কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে- "যদি তোমরা দৃঢ়পদ থাকো ও আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে কাফিরদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"। (টীকা ৪৭)

ধৈর্য ও তাকওয়ার পুরষ্কার হিসাবে মুসলমানরা মানসিক শান্তি লাভ করে ও আধ্যাত্মিক এবং জাগতিকভাবে উপকৃত হয়। কুরআনে আল্লাহ মুসলমানদের অসাধারণ মনোভাব ও অলৌকিক সাহায্যের কথা বর্ণনা করেন।

"ওদেরকে লোকে বলেছিল ঃ তোমাদেরকে শত্রু ঘেরাও করছে, তাই তাদেরকে ভয় করো ; কিন্তু এতে বিশ্বাসীদের ঈমান আরো বেড়ে যায় ও তারা বলে ; আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই সেরা অভিভাবক। তাই তারা আল্লাহ'র রহমত ও অনুগ্রহসহ ফিরে আসে ও কোন অশুভ কিছু তাদের স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহ'র সন্তুষ্টি কামনা করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ'র অনুগ্রহ অসীম"। *[সূরা ইমরান ; ৩ ঃ ১৭৩-১৭৪]*

কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য- তবুও তারা ব্যর্থ হয়। এর কারণ রাসূল (দঃ) একজন রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি আল্লাহ'র হেফাজতে ছিলেন। আল্লাহ বলেন, অলৌকিকভাবেই রাসূল (দঃ) রক্ষা পান ঃ "...তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তারা যা করে তার সব কিছুই আল্লাহ'র আয়ত্তে"। *[সূরা ইমরান ; ৩ ঃ ১২০]*

অন্য আয়াতে আল্লাহ কথা দেন কোন মানুষ ভবিষ্যতে রাসূল (দঃ)-কে শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

"আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও ক্ষমা না থাকলে তাদের এক দল তোমাকে নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত করতো ; কিন্তু তারা কেবল নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করে ও তোমার কোন

ক্ষতি তারা করতে পারবে না। আল্লাহ তোমাকে আসমানী কিতাব ও জ্ঞান দান করেছেন ও শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। নিশ্চয়ই তোমার উপর আল্লাহ'র মহা অনুগ্রহ রয়েছে"। *[সূরা নিসা ; ৪ ঃ ১১৩]*

"এরা এমন মানুষ যারা মিথ্যা শুনতে ভালবাসে ও হারাম খায়। যদি তারা তোমার কাছে আসে, তাহলে হয় ন্যায়বিচার করো অথবা ওদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করো, ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি তুমি মীমাংসা করো, তবে ন্যায়-বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ন্যায় কাজ করে"। *[সূরা মায়েদাহ ; ৫ ঃ ৪২]*

৯. অদৃশ্যের জ্ঞান রাসূল (দঃ)-কে দেয়া হয়

একমাত্র আল্লাহ'রই আছে অদৃশ্যের পুরো জ্ঞান। অতীতের খুঁটিনাটি তথ্য থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ সবই জানেন। তিনিই সময় সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। আল্লাহ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আল্লাহ জানেন মহাবিশ্বের কোথায় কী ঘটছে ও তিনিই এর নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি সব কিছুর রহস্য জানেন। তিনি তাঁর নির্বাচিত রাসূলদের (দঃ) এই জ্ঞানের কিছুটা দান করেন- ততটুকুই যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।

"আল্লাহ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন - এই জ্ঞান তিনি আর কাউকে দেন না তাঁর রাসূল ছাড়া যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ; সে সময় তিনি পাহারা বসান রাসূল (দঃ)-এর সামনে ও পিছনে। *[সূরা জিন ; ৭২ ঃ ২৬-২৭]*

কুরআনে বলা আছে হযরত ইউসুফ, ঈসা ও মুহাম্মাদ (দঃ) ছিলেন এমন নির্বাচিত রাসূলদের অন্যতম যাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান কিছু দান করা হয়েছিল। আল্লাহ রাসূল (দঃ) এর বেশ কিছু রহস্য প্রকাশ করেন। রাসূল (দঃ) অতীতের এমন কিছু ঘটনার কথা জানতেন যা জানা অন্য কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা সম্পর্কেও জানতেন ' "এ হচ্ছে অদৃশ্যের জ্ঞান যা আমি তোমাকে জানালাম"। *[সূরা ইউসুফ ; ১২ ঃ ১০২]*

অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ রাসূল (দঃ)-এর নিজের ক্ষমতার অধীনে ছিল না। এটা একটা মুযেজা যা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। রাসূল (দঃ) অদৃশ্য সম্পর্কে ততটুকুই জানতেন যা আল্লাহ নিজ ইচ্ছা মতো তাঁকে জানান। রাসূল (দঃ) মাঝে মাঝে মানুষকে এমন কিছু বলতেন যা একমাত্র আল্লাহ'র ওহী লাভ ছাড়া অন্যভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এটা একটা প্রমাণ যে তিনি আসলেই আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)।

অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পরেও রাসূল (দঃ) ছিলেন বিনীত ও অনুগত ; "বলো ঃ আল্লাহ'র ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপর কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিজের যদি অদৃশ্যের জ্ঞান থাকতো, তাহলে তো আমি প্রচুর কল্যাণ লাভ করলাম আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি কেবল একজন সতর্ককারী আর বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা"। *[সূরা আরাফ ; ৭ ঃ ১৮৮]*

এই অনন্য জ্ঞান রাসূল (দঃ) লাভ করেন কুরআন ও অন্যান্য ঐশ্বরিক সূত্র থেকে। কিছু জ্ঞান ছিল অল্প দিনের মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে যেমন যুদ্ধ জয়ের ভবিষ্যত বাণী। কিছু জ্ঞান ছিল এমন ঘটনা সম্পর্কে যা ঘটবে রাসূল (দঃ) এর মৃত্যুর কয়েক বছর পর যেমন কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়া।

বিশেষ কিছু জ্ঞানও রাসূল (দঃ) এর ছিল যেমন কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ-যেগুলি ওহী আসার ১৪০০ বছর পরেও এখনো সবগুলি ঘটেনি- আরো পরে ঘটবে। আল বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আল তিরমিযী, আল নাসাই, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা একমত যে হাদীসে রাসূল (দঃ)-এর কাহিনীতে অদৃশ্যের জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল (দঃ) এমনসব ঘটনা জানতেন যা অন্য কেউ জানতো না

রাসূল (দঃ) এমন সব ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে জানতেন যা অন্য কারো পক্ষে জানা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এটা ঘটে কেননা আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ) কে সে সব গোপন কথা জানিয়ে দিতেন।

কুরআনে আল্লাহ এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। রাসূল (দঃ) একটি গোপন কথা তাঁর এক স্ত্রীকে বলে কাউকে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাসূল (দঃ) এর স্ত্রী সে কথা অন্য একজনের কাছে ফাঁস করে দেন। আল্লাহ এটি রাসূল (দঃ) কে জানান। রাসূল (দঃ) যখন তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে তিনি জেনে ফেলেছেন ঘটনাটা। তখন স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চান রাসূল (দঃ) কিভাবে ঘটনাটি জানলেন। রাসূল (দঃ) এর উত্তর ছিল- আল্লাহ'ই জানিয়েছেন আমাকে।

কুরআনের সূরা তাহরিমে এর উল্লেখ আছে ঃ

"নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপন কথা বলার পর স্ত্রী অন্যকে বলে দিল, আল্লাহ তা নবীকে জানান। নবী এ ব্যাপারে স্ত্রীকে কিছু বললো আর কিছু অংশ বললো

না। স্ত্রী জানতে চাইলো, আপনাকে কে এসব বলেছে ? নবীর উত্তর, যিনি সব জানেন ও সব বিষয়ে অবগত তিনিই আমাকে এটা বলেছেন"।

[সরা তাহরিম ; ৬৬ ঃ ৩]

আরেকটি ঘটনা, বদর যুদ্ধের পর রাসূল (দঃ) এর চাচা আব্বাসকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে রাসূল (দঃ) এর সামনে আনা হয়। চাচা ছিল কাফির। তাকে রাসূল (দঃ) প্রশ্ন করেন- মুসলিম বাহিনীকে তিনি কী মুক্তিপণ দেবেন ? চাচা জানায় তার কাছে কোন অর্থ নেই।

রাসূল (দঃ) তখন জানতে চান মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্য রওনা হওয়ার আগে যে অর্থ তিনি স্ত্রী উম্মে আল ফজলকে দিয়ে এসেছেন সেটা কী হলো ? আব্বাস অবাক হয়ে জানতে চায় কিভাবে রাসূল (দঃ) এই অর্থের কথা জানলেন ? কেননা, রাতের বেলা গোপনে স্ত্রীকে তা দেয়া হয়েছে - অন্য কেউ এ সম্পর্কে জানে না।

রাসূল (দঃ) বলেন যে আল্লাহ তাঁকে এই কথা জানিয়েছেন। আব্বাস তখন বুঝতে পারে যে মুহাম্মাদ (দঃ) সত্যিই আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)। সে তখনই ইসলাম কবুল করে (মুসনাদ আহমেদ, মুসলিম, তফসীর ইবনে কাসীর)।

আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করে কিছু মানুষের মনের গোপন কথা ও গোপন আচার-আচরণ সম্পর্কে জানান।

আল্লাহ মুনাফিকদের মিথ্যা সম্পর্কে ও মুখের কথায় আড়ালে তাদের সত্যিকারের মনোভাব কী- যা কিছুই প্রকাশ করেন। এতে রাসূল (দঃ) বুঝতে পারেন কে সত্যিকারের মুসলমান ও কে মুনাফিক। ফলে কোন মানুষকে বিশ্বাস করা যায় আর কাকে যায় না, তা রাসূল (দঃ) সহজেই বুঝতে পারেন।

রাসূল (দঃ) ছিলেন মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু, তাই আল্লাহ'র তরফ থেকে এটা ছিল সত্যিই বড় রকমের সাহায্য ও হেফাজত।

আল্লাহ রাসূল (দঃ)-কে আরো জানান তিনি কী বলবেন, কী করবেন ঃ

"তখন তিনি দুঃখের পর তোমাদের মনে স্বস্তি দিলেন, তোমাদের মধ্যে একদল শান্তিতে ঘুমালে, অন্য দল অনর্থক দুঃশ্চিন্তা ও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা চিন্তা করছিলো- যা ছিল মুর্খতার যুগের চিন্তা। তারা বলছিলো, আমাদের কি কোন অধিকার নেই এ ব্যাপারে ?

বল ঃ সব বিষয় কেবল আল্লাহ'র এখতিয়ার। তারা তোমার কাছে প্রকাশ করেনি আর নিজেদের মনে কিছু কথা গোপন রেখেছিল। তারা বলে ঃ আমাদের

যদি কোন অধিকার থাকতো, তাহলে কেউ এখানে এসে মারা যেত না। বলো ঃ "তোমরা যদি তোমাদের ঘরের ভিতরেও থাকতে, যেখানে যার মারা যাওয়ার কথা সে সেখানেই হাজির হতো।

তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন, পরিশুদ্ধ করেন। তোমাদের মনের গোপন খবর আল্লাহ জানেন"। *[সরা ইমরান ; ৩ ঃ ১৫৪]*

"তারা কেবল মুখে বলে 'আমরা অনুগত' অথচ তোমার থেকে দূরে গিয়ে তাদের একদল মুখে যা বলে তার বিপরীত ষড়যন্ত্র করলো সারারাত ধরে ; আল্লাহ তাদের রাতের ষড়যন্ত্র লিখে রেখেছেন। তাদের যা খুশী করতে দাও আর আল্লাহতেই কেবল বিশ্বাস রাখো অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ'ই যথেষ্ট।
[সূরা নিসা : ৪ ঃ ৮১]

"যে আরবেরা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা তোমাকে বলবে ঃ 'সম্পদ ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল ; তাই আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তারা মুখে যা বলে মনে তা বিশ্বাস করে না। বলো ঃ 'আল্লাহ যদি তোমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে চান, তাহলে কার ক্ষমতা আছে আল্লাহকে আটকাবার ?' তোমরা যা করো, আল্লাহ তা সব জানেন। *[সূরা ফাতহ ; ৪৮ ঃ ১১]*

"কুফরীর বশে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা তাদের স্বার্থে মুসলমানদের ক্ষতি করা ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য যারা মসজিদ বানিয়েছে, তারা শপথ করবে ঃ 'আমরা শুধু কল্যাণ চাই।' আল্লাহ সাক্ষী- এরা মিথ্যাবাদী। তুমি কখনোই ঐ মসজিদে নামাজ পড়বে না।

তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত, সেই মসজিদই তোমার নামাজ পড়ার উপযুক্ত জায়গা। সেখানে এমন মানুষ আছে যারা পবিত্র হতে ভালবাসে। যারা পবিত্র আল্লাহ তাদের ভালভাসেন"।
[সূরা তওবা : ৯ ঃ ১০৭-১০৮]

মানুষ জানতে চাওয়ার আগেই রাসূল (দঃ) উত্তর দিতেন

হাদীসে আছে, মানুষ প্রশ্ন করার আগেই রাসূল (দঃ) উত্তর দিয়ে দিতেন। তিনি জানতেন কে তাঁর বাসায় আসবে, কেউ ঘরে ঢুকার আগেই তিনি বলে দিতেন সে সম্পর্কে। কারো কেন দেরী হলো সেটাও তিনি জানতেন। (টীকা ৪৮)

হাদীসে এ ধরণের বহু মুযেজার কথা আছে।

আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারীম মনে মনে ভাবছিলো এমন প্রশ্নের উত্তর রাসূল (দঃ) একবার তাকে দেন। মসজিদে এক পাশে বসা ছিল আবু সুফিয়ান। রাসূল (দঃ) ঘর থকে বের হলেন। তাঁকে দেখে আবু সুফিয়ান নিজ মনে বললোঃ "আমার অবাক লাগে ভাবতে সে কী করে জয়ী হলো ?" রাসূল (দঃ) তার কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আমি তোমাদেরকে হারিয়েছি আল্লাহ'র সাহায্যে"। আবু সুফিয়ান বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)। (ইবনে আল হারিথ, ইবনে হাজর আল আসকালানী, আল মাতালিব আল আনিয়াহ)।

ওয়াবিসাহ ইবনে মাসুদ সম্পর্কে একটি হাদীস আছে। এতে বলা হয়েছে যে প্রশ্নের কথা সে ভেবে এসেছিল, তা জানতে চাওয়ার আগেই রাসূল (দঃ) উত্তর দিয়ে দেন। ওয়াবিসাহ বলে, "আমি রাসূল (দঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এসেছো বির (birr) সম্পর্কে জানতে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। রাসূল (দঃ) বললেন, তোমার মনকে প্রশ্ন করো উত্তরের জন্য। বির হচ্ছে ধর্মের প্রতি অনুরাগের সেই অবস্থা যাতে একজনের মনে শান্তি থাকে। এর বিপরীতে ইথম বা ধর্মহীনতায় মানুষের দেহ-মন অশান্ত থাকে। মনে সবসময় ইতস্ততঃ ভাব থাকে সঠিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে। মানুষ যদিও তাকে বলে কোন বিষয়ে যে এটা বৈধ, তার মন তা গ্রহণ করতে পারে না। (এই সহীহ হাদীস ইসনাদসহ বর্ণনা করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আদ দারিমী)।

রাসূল (দঃ) যে মানুষের মনের কথা ও ইচ্ছার কথা জনতে পারতেন তার আরেকটি উদাহরণ হলো আবুদ দারদার মুসলমান হওয়ার ঘটনা। সে ছিল মূর্তি পূজারী। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ ও আবু সালামাহ গিয়ে একদিন সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেললো। আবুদ দারদা এসে তা দেখে ভাঙ্গা মূর্তিকে না বলে পারলো না, "তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারলে না কেন ?" পরে সে রাসূল (দঃ) এর কাছে যায়। ইবনে রাওয়াহাহ দূর থেকে তাকে দেখে বললো- আবুদ দারদা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজ করার জন্য আসছে"।

আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) বললেন, না। সে আসছে মুসলমান হওয়ার জন্য। আমার প্রভু কথা দিয়েছেন আবুদ দারদা মুসলমান হবে। (টীকা ৪৯)

রাসূল (দঃ) নিজের মৃত্যুর কথা আগেই সাহাবীদের জানিয়ে রেখেছিলেন

রাসূল (দঃ) এর একটি মুযেজা যা আল্লাহ তাঁকে দান করেন তাহলো উনি নিজের ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীর (রাঃ) মৃত্যুর কথা আগে থেকেই জানতেন।

হাদীসে আছে রাসূল (দঃ) বলেন ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের আগে তিনিই সবার আগে মারা যাবেন।

আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) আমাদের দিকে তাকালেন ঃ তোমরা মনে করো আমি তোমাদের সবার পরে মারা যাবো ; সাবধান ; আমি তোমাদের সবার আগে মারা যাবো। আমার মৃত্যুর পর তোমরা মারা যাবে। (টীকা ৫০)

উকাবাহ ইবনে আমীর বলেন ঃ রাসূল (দঃ) বের হয়ে আসলেন ও উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়ালেন। এরপর তিনি মিম্বরে উঠলেন ও বললেন ঃ আমি তোমাদের আগে যাবো ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকবো। আল্লাহ'র শপথ- আমি এই মুহূর্তে আমার কবর দেখতে পাচ্ছি।

দুনিয়ার সম্পদ ভান্ডারের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে– আল্লাহ'র শপথ- আমি এই ভয় পাই না যে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা পৌত্তলিক হবে। কিন্তু আমার ভয় তোমরা সম্পদের মোহে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। (বুখারী)। আবু মুওয়াহিবাহ বলেন- আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) মাঝরাতে আমাকে ডাকলেন, বললেন- বাকি কবরবাসীদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে আমাকে বলা হয়েছে। তুমি আমার সাথে আসো"।

আমি রাসূল (দঃ) এর সাথে গেলাম। তিনি কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করলেন, হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক্। তোমাদের কবরের জীবন এই দুনিয়ার মানুষের জীবনের চেয়ে যেন শান্তিময় হয়। দুঃখ-কষ্ট অন্ধকার রাত্রির মতো একের পর এক আসছে। একটি অন্যটির থেকে বেশী খারাপ।"

এরপর রাসূল (দঃ) আমার কাছে সরে এসে বললেন ঃ আবু মুওয়াহিবাহ ; আমাকে জগত সম্পদের চাবি ও দীর্ঘ জীবন অথবা আমার প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ ও বাগানের কথা বলা হয়েছে। আমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ ও বাগান বেছে নিয়েছি। (আত-তাবারী, আহমেদ, ইবনে সাদ, আল বাগহাউই ও ইবনে মানদাহী)। রাসূল (দঃ) তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন। এমন কী, কোনদিন মারা যাবেন, কোন শহর থেকে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে যাবেন- সবই বলে যান- "আমি সোমবারে জন্মেছি ; ওহী আসে সোমবারে ; আমি সোমবারে হিযরত করি ও সোমবারেই আমি যারা যাবো"। (টীকা ৫১)

ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূল (দঃ) জন্মেছেন এক সোমবার। তিনি রাসূল (দঃ) হন এক সোমবারে। তিনি মক্কা থেকে হিযরত করেন এক সোমবারে ও মদীনায় ঢুকেন এক সোমবারে। মক্কা এক সোমবারে ইসলামের জন্য খুলে যায়

ও রাসূল (দঃ) মারা যান এক সোমবারে (ইবনে হাম্বলে ও আল বায়হাকী)। (টীকা ৫২)

যে শহরে আমি হিযরত করেছি ও যেখানে আমি মারা যাবো - যেখানে মৃত্যুর পর আমার কবর হবে- তাহলো মদীনা। (টীকা ৫৩)

মদীনায় আমি হিযরত করি, মদীনায় আমি মারা যাবো ও সেখান থেকে উঠবো। (টীকা ৫৪)

রাসূল (দঃ) কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেন

আল্লাহ'র তরফের মুযেজা হিসাবে রাসূল (দঃ) যেমন নিজ মৃত্যুর কথা আগেই বলেন, তেমনি সাহাবীদের মৃত্যুর অনেক আগেই কয়েকজনের মৃত্যুর কথা বলেন। হাদীসে এ ধরণের বহু বর্ণনা আছে। রাসূল (দঃ) কয়েকজন সাহাবী শহীদ হবেন ও কোথায় তারা যাবেন সেটাও বলেন।

উমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী

আনিস বিন মালিক বলেন ঃ রাসূল (দঃ) একবার উহুদ পাহাড়ে যান আবু বকর, উমর ও উসমানকে নিয়ে। পাহাড় তখন নড়ে উঠে। রাসূল (দঃ) পাহাড়কে বলেন " "থেমে যাও। তোমার উপরে আছেন একজন রাসূল (দঃ), একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ। (বুখারী)।

উসমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী

আনাস থেকে ইবনে আদি ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (দঃ) বলেন, উসমান ; আমি যখন থাকবো না, তখন তুমি খলিফার দায়িত্ব পাবে। মুনাফিকরা চাইবে তুমি খলিফা হতে রাজী হবে না। তুমি খলিফা হতে অস্বীকার করবে না, তবে সেদিন রোজা রাখবে। তাহলে আমার সাথে রোজা ভাঙতে পারবে। (গ্রন্থ ঃ তারিক দিমাস্ক)।

যায়েদ ইবনে আকরাম বলেন ঃ রাসূল (দঃ) আমাকে বললেন, "আবু বকরের (রাঃ) কাছে যাও। তুমি দেখবে সে ঘরের ভিতর কাপড় পেঁচিয়ে শুয়ে আছে ; পা উপরের দিকে মেলানো। তাঁকে বেহেশতের সুখবর দাও। এরপর পাহাড়ের উপরে যাও যতক্ষণ না উমরকে (রাঃ) পাও। দূর থেকে আবছাভাবে দেখবে গাধার পিঠে দীর্ঘদেহী উমর (রাঃ) কে। তাঁকে বেহেশতের সুখবর দাও।

এরপর যাবে ওসমান (রাঃ) এর কাছে। তাঁকে তুমি দেখবে বাজারে মাল কেনা-বেঁচা করছে। তাঁকে মর্মান্তিক এক অগ্নি-পরীক্ষার পর বেহেশত লাভের সুখবর দাও।" আমি তাঁদের কাছে গেলাম। রাসূল (দঃ) যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তাঁদেরকে পেলাম ও সুখবর জানালাম। [যায়েদ থেকে এটি বর্ণনা করেন আত তাবারানী (দালাইল আন নুবুওয়াহ ও আদ-দাহাবী সিয়ারে)]।

রাসূল (দঃ) বলেন- ওসমান আমার পাশ দিয়ে গেল। আমার সাথে যে ফিরিশতারা ছিল, তাদের একজন বললো ঃ এ একজন শহীদ। এর লোকই একে খুন করবে। আমরা ওর জন্য দুঃখিত।

[যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে এটি উল্লেখ করেন আত তাবারানী তাঁর আল কাবীর গ্রন্থে]।

রাসূল (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেন

রাসূল (দঃ) আলী (রাঃ) কে বলেন ঃ মানুষের মধ্যে সে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে তোমাকে এখানে আঘাত করবে- রাসূল (দঃ) ইশারা করলেন (আলীর কপালের দিকে) যতক্ষণ না রক্তে ডুবে যায় (ইশারা করলেন দাড়ির দিকে)।

(এই হাদীস আমর ইবনে ইয়াসির থেকে আবু নায়ীম বর্ণনা করেন ও আল হাকিম একে বিশুদ্ধ বলেছেন। এই হাদীসের উল্লেখ আছে আহমেদের মুসনাদ, আন-নাসাই এর সুনান আল কুবরা, আবু নায়ীম এর দালাইন আন নুবুওয়াহ ও আল হাকীম গ্রন্থে)।

আরেকটি হাদীসে বলা আছে- রাসূল (দঃ) আলী (রাঃ) কে বলেন ঃ তুমি নেতা ও খলিফা হবে। সত্যিই এটি (দাড়ি) রক্তে লাল হবে (অর্থাৎ কপাল ও মাথার ক্ষতস্থান থেকে বের হওয়া রক্ত)।

এই হাদীস যাবির ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনা করেন আত তাবারানী ও আবু নায়ীম। এটি তাবারানীর আল কাবীর ও আল আওসাত গ্রন্থে আছে। আনাস বলেন ঃ অসুস্থ আলী (রাঃ) কে দেখতে আমি রাসূল (দঃ) এর সাথে গেলাম। আবু বকর (রাঃ) ও উমরও (রাঃ) সেই সময় আলীকে দেখতে আসেন। একজন অন্যজনকে বলেন ঃ আমার মনে হয় না আলী বাঁচবে। শুনে রাসূল (দঃ) বললেন ঃ সত্য হলো এই, আলী তো শহীদ হবে (বর্ণনাকারী আল হাকিম)।

হুসেইন (আঃ)-এর ধর্মযুদ্ধে নিহত হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী রাসূল (দঃ) করে যান

উম্মে সালামাহ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন ইবনে রাহওয়াইহ, আল বায়হাকী ও আবু নায়ীম।

রাসূল (দঃ) একদিন শুয়ে পড়ার পর জেগে উঠলেন। মুঠো ভর্তি করে হাতে মাটি নিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিলেন। আমি জানতে চইলাম ঃ হে আল্লাহ'র রাসূল (দঃ) ঃ এই মাটি কী ? তিনি বললেন ঃ "জিবরাইল (আঃ) জানালেন এ (অর্থাৎ হুসেইন ইরাকের মাটিতে নিহত হবে ও এটা হচ্ছে ওর শেষ বিশ্রামস্থল।)"

(এই হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনে আবি আসিমের আল আহাদ ওয়া আল মাতহানি, আত তাবারানীর আল কাবীর ও আর হাকীমে।)

আনাস ইবনে আল হারীম থেকে নিচের হাদীসটি বর্ণনা করেন ইবনে আস সাকান, আল বাগহাওয়া ও আবু নায়ীম।

রাসূল (দঃ) বললেন ঃ সত্যিই আমার এই ছেলে- অর্থাৎ হুসেইন (আঃ) কারবালায় খুন হবে। তোমাদের মধ্যে যারা সে সময় বেঁচে থাকবে, তারা ওকে সাহায্য করো ; এ কারণে আনাস ইবনে আল হারীস কারবালায় যান ও হুসেইন (আঃ)-এর সাথে নিহত হন। (সুহাইম থেকে বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক ; এই হাদীসের বর্ণনা আছে আবু নায়ীমের দালাইল গ্রন্থে)।

উমর, উসমান, আলী ও হুসেইন (আঃ) সম্পর্কে রাসূল (দঃ)-এর এসব ভবিষ্যত বাণী একের পর এক সত্য প্রমাণিত হয়। রাসূল (দঃ)-এর মৃত্যুর পর অনেক বিশ্বাসী মুসলমান যারা ইসলাম প্রচারের গুরু দায়িত্ব নিজেদের উপর নিয়েছিলেন তারা শহীদ হন।

কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ও হাদীসে নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর বিশেষ কিছু এলাকায় বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এসব ভবিষ্যৎবাণী করা হয় ঘটনা ঘটার অনেক আগে।

বাইযেনটাইনদের জয়

কুরআনের সূরা রুমের শুরুতে একটি ভবিষ্যৎবাণী আছে। এই আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, রোমক বা বাইযেনটাইন সম্রাট যুদ্ধে পারসিয়ানদের বিরুদ্ধে খুব তাড়াতাড়ি জয়ী হবে ঃ

"আলিফ-লাম-মীম ; রোমানরা হেরে গিয়েছে কাছের এলাকাতে কিন্তু এই পরাজয়ের পর তারা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জয়ী হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাই আল্লাহ'র এখতিয়ারে। সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে"।

[সূরা রুম ; ৩০ ঃ ১-৪]

(অনুবাদকের সংযোজন ঃ কুরআনে ব্যবহৃত আদনাল আরদ শব্দ দুইটির অন্য একটি অর্থ হলো সবচেয়ে নীচু ভূমি। অবাক করা ব্যপার হলো যুদ্ধ যেখানে হয়েছিল অর্থাৎ সমুদ্র পৃষ্ঠের ৩৯৫ মিটার নিচে ডেড সী এলাকায় (সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্ডান এর আন্তঃসংযোগ এলাকায়), তা সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে নীচু এলাকা। এই তথ্য সে যুগে কোন মানুষের পক্ষে জানা ছিল অসম্ভব।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সাম্প্রতিক সময়েই কেবল এই তথ্য জানা গিয়েছে। আল্লাহ আজ থেকে হাজারো বছর আগে তাঁর উম্মী রাসূলের মুখ থেকে এমন আয়াত বিশ্ববাসীকে শোনালেন যাকে কেবল মুযেজা হিসাবেই বলা যেতে পারে। এ নিয়ে আরো জানতে পড়ুন হারুন ইয়াহিয়ার পবিত্র কুরআনের মুযেজা।

যদি কেউ মনে করেন যে, না, সবচেয়ে নীচু অর্থে নয় বরং কাছে অর্থেই আদনাল আরদ এর প্রয়োগ হয়েছে তবুও এই আয়াতে কিছু চমৎকার মুযেজা দেখি আমরা।

অল্প কয়েক বছর বলতে এই আয়াতে তিন থেকে নয় বছর বোঝানো হয়েছে। ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে জরোস্ট্রান পারসিয়ানরা খৃষ্টান বাইযেনটাইনদের হারিয়ে দেয় এন্টিয়কে এবং বিজয়ী হয় দামাস্ক, সিলিযিয়া, টারসাস, আরমেনিয়া ও জেরুজালেমে।

বিশেষ করে ৬১৪ খ্রস্টাব্দে জেরুজালেমের পতন ও Holy Sepulchre গীর্জা (যেখানে যীশু খ্রীষ্টকে কবর দেয়া হয় বলে খৃষ্টানদের বিশ্বাস) সেই পবিত্র সমাধি ধ্বংস খুবই বড় আঘাত ছিল। (টীকা ৫৫)

রোমানদের বিজয়ের যে ভবিষ্যত বাণী কুরআনে করা হয় তা সাত বছর পর ৬২০ খ্রিস্টাব্দে সত্য হয়। ঐ সময় রোমানরা চারিদিক থেকে নানা ধরনের হুমকি মোকাবেলা করছিল। শুধু যে পারসিকদের তরফ থেকে হুমকি ছিল তা নয়- অন্যান্য শত্রুরা ছিল আভার, স্লাভস ও লোমবার্ডস। আভাররা চলে এসেছিল কনস্ট্যান্টিনোপলের সীমানায়।

সেনাবাহিনীর খরচ মেটানোর জন্য বাইযেনটাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস গীর্জায় রাখা বিভিন্ন সোনা, রুপার অলংকার গলিয়ে মুদ্রা বানান। শুধু এতে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্তিও গলিয়ে মুদ্রা বানান। রোমক সম্রাটের বিরুদ্ধে অনেক গভর্ণর বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও একসময় মনে হতে থাকে সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়বে। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে এটাই ধরে নেয়া হয়েছিল বাইযেনটাইন সাম্রাজ্যের পতন হবেই। আরবের পৌত্তলিকরা নিশ্চিত ছিল রোমানদের ব্যাপারে কুরআনের ভবিষ্যত বাণী কখনোই সত্য হবে না। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস আর্মেনিয়া আক্রমণ করেন ও পারসিয়ানদের একাধিক যুদ্ধে পরাজিত করেন। (টীকা ৫৬)

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে রোমান ও পারসিয়ানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। বর্তমান ইরাকের বাগদাদের কাছে টাইগ্রিস নদীর ৫০ কিলোমিটার পূর্বে নাইনভিহ এর ধ্বংসস্তুপের কাছে এই যুদ্ধ হয়। এখানে রোমক বা বাইযেনটাইনিজরা পারসিকদের হারিয়ে দেয়। কয়েক মাস পর পারসিকরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় ও তাদের দখলে থাকা বহু এলাকা রোমানদের ফিরিয়ে দেয়। (টীকা ৫৭)

পারস্য রাজ দ্বিতীয় খসরুর বিরুদ্ধে রোমকদের জয় পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন জেরুজালেম ও যীশুর সমাধিস্থল (Church of the Holy Sepulchre) আবারো খৃষ্টানদের অধিকারে আসে। (টীকা ৫৮)

তাই বলা যায়, কুরআন ও রাসূল (দঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী "তিন থেকে নয় বছরের" মধ্যে রোমানদের বিজয় অলৌকিকভাবেই সত্যে পরিণত হয়।

ইসলামের জন্য মক্কার দুয়ার খুলে গেল

মুসলমানরা যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করেন, তখন কাফিররা মুসলমানদের জন্য মক্কায় ফেরার পথ কঠিন করে ফেলে। তারা মুসলমানদের হজ্জ ও উমরাহ পালনেও বাধা দেয়। এছাড়াও মক্কার কাফিররা মদীনার মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা চালাবার চেষ্টা করে। তবে তা সফল হয়নি।

হিজরতের ছয় বছর পর রাসূল (দঃ) স্বপ্ন দেখেন তিনি ও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) ইহরাম পরে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করছেন। সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে তারা তাওয়াফ করছেন- কাফিরদের তরফ থেকে কোন আক্রমণের ভয় তারা করছেন না। রাসূল (দঃ) সাথে সাথে সাহাবীদের কাছে এই ভাল স্বপ্নের কথা জানালেন।

ইসলামের জন্য মক্কার দুয়ার খুলে যাওয়ার বিষয়ে আবু মুসা থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (দঃ) বলেন- আমি স্বপ্নে একটি তরবারী ঘুরালাম। সেটা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গেল। এটি উহুদ যুদ্ধে বিশ্বাসীদের ক্ষয়-ক্ষতির প্রতীক। আমি আবার তরবারী ঘুরালাম- সেটা আগের থেকে অনেক ভাল তরবারীতে পরিণত হলো। এটা ইসলামের জন্য মক্কার উন্মুক্তকরণ ও আল্লাহ'র তরফ থেকে বিশ্বাসীদের সমবেত করা বোঝাচ্ছে।

রাসূল (দঃ)-কে সাহায্য ও সমর্থন দান করে আল্লাহ কুরআনের সূরা ফাতহের ২৭ নং আয়াত নাজিল করলেন। আল্লাহ জানালেন রাসূল (দঃ) এর স্বপ্ন সত্য ও আল্লাহ'র ইচ্ছায় রাসূল (দঃ) ও সাথীরা মক্কায় ঢুকবেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন ঃ 'ইনশাআল্লাহ তোমরা অবশ্যই মসজিদ উল হারামে নিরাপদে ঢুকবে, মাথা কামাবে বা চুল কাটবে কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই।' তিনি জানেন যা তোমরা জানো না।; তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন এক আসন্ন বিজয়"। *[সূরা ফাতহ : ৪৮ ঃ ২৭]*

হিজরতের ছয় বছর পর জিলকদ্দ মাসে রাসূল (দঃ) ১৫০০ সাথীসহ মক্কায় রওনা হন উমরাহ পালনের জন্য। এতে মক্কার পৌত্তলিকরা রেগে যায় ও বেরিয়ে পড়ে রাসূল (দঃ)-কে বাধা দিতে। রাসূল (দঃ) মুসলমানদেরকে নিয়ে মক্কার উত্তরে হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপন করেন। দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় ও একটি চুক্তি হয়। এর ফলে মুসলমানরা অন্যান্য সুবিধার মধ্যে নিরাপদে পরে উমরাহ করার সুযোগ পায়- যেমনটি ভবিষ্যৎবাণী করা হয় সূরা ফাতহায়। তাফসীর আল জালালাইনে এই আয়াতে ব্যাখ্যা এমন –

হুদাইবিয়ার চুক্তির বছরে রাসূল (দঃ) স্বপ্ন দেখেন তিনি মক্কায় ঢুকছেন। সাথীসহ তিনি মাথার চুল কামাচ্ছেন, কেউ বা চুল ছোট করছেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের জানালে তারা সবাই আনন্দিত হোন। তাই যখন তারা রাসূল (দঃ)-এর সাথে বের হলেন ও হুদায়বিয়াতে কাফিরদের বাধার মুখে ফিরে আসলেন- এটা মেনে নেয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু মুনাফিক সন্দেহে পড়ে যায়। কুরআনে বলা হয় "তিনি জানেন যা তোমরা জানো না ও – আসন্ন বিজয়" – এটা ছিল ইসলামের জন্য খাইবারের উন্মুক্তকরণ। স্বপ্ন সত্যি হয় পরের বছরেই। (টীকা ৫৯)

ইসলামের জন্য মিসর উন্মুক্তকরণ

আবু দার বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (দঃ) বলেন, তোমরা খুব তাড়াতাড়িই মিসর জয় করবে। এটা সেই ভূমি যার নামে কিরাত এর নামকরণ হয়েছে (টীকা

৬০)। তাই তোমরা যখন মিসর জয় করবে, তখন সেখানকার মানুষদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে (মুসলিম)।

এই হাদীসে ইসলামের জন্য মিসরের দ্বার খুলে যাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। যখন এটা বলা হয়, তখন রোম সম্রাট মিসর শাসন করতেন। মুসলিম বাহিনীর তখন এই ক্ষমতা ছিল না যে তারা রোমান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করবে। রাসূল (দঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী পরে সত্য হয়। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে মুসলমানরা আমর ইবনে আল আস এর নেতৃত্বে মিসর জয় করে। (টীকা ৬১)

রোম ও পারস্য জয়

খসরু মারা যাবে ও তার পরে আর কোন খসরু থাকবে না। সিজার মারা যাবে আর তারপরে অন্য সিজার থাকবে না ; কিন্তু তোমরা আল্লাহ'র পথে তাদের সম্পদ খরচ করবে (মুসলিম)।

'খসরু' শব্দটি ব্যবহৃত হতো প্রাচীন পারসিক রাজাদের জন্য। 'সিজার' ছিল রোমান সম্রাটদের পদবী। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কেবল বাইযেনটাইন রাজারা এই পদবী ব্যবহার করতো। রাসূল (দঃ) ভবিষ্যত বাণী করেন যে এই দুই রাজার ধন-সম্পদ মুসলমানদের অধিকারে আসবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর সময় পারসিয়ান ও বাইযেনটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের মতো শক্তি মুসলমানদের ছিল না। সামরিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক- কোনদিক থেকেই এই দুই শক্তিশালী বাহিনীর সমকক্ষতা ছিল না মুসলমানদের। পরে সব ভবিষ্যৎবাণীই সত্য হয়।

উমর (রাঃ) যখন খলিফা হলেন, পারস্য তখন মুসলমানদের অধিকারে আসলো- খসরুর রাজত্বের পতন ঘটলো। আবু বকর (রাঃ) যখন খলিফা, তখন ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার সিজার হেরাক্লিয়াসের মৃত্যুর আগে রোমদের সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা মুসলিমরা জয় করে নেয়। যেমন জর্ডান, ফিলিস্তিন, দামাস্ক, জেরুজালেম, সিরিয়া ও মিসর। অবশেষে অটোমান সুলতান ফাতিহ কনস্ট্যানটিনোপল জয় করেন ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। (টীকা ৬২)

সুলতান মেহমদ যিনি মেহমদ দি কনকারার নামে পরিচিত ছিলেন- তিনি হাদীসের ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রমাণ করেন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম আহমেদ।

পূর্ব এলাকায় রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সিজার (কিসরা) পদবীর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যা অসম্ভব মনে হয়েছিল, সেই সব বড় বড় সাফল্য মুযেজা হিসাবে আল্লাহ তাঁর রাসূল (দঃ) ও উত্তরসূরীদের জন্য দান করেন।

রাসূল (দঃ) পারস্যরাজ খসরুর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন

ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূল (দঃ) বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের কাছে দূত ও চিঠি পাঠান। ঐতিহাসিক সূত্র মতে, এদের মধ্যে কেউ কেউ সাথে সাথেই সেই দাওয়াত কবুল করেন। অন্যরা সত্যকে অস্বীকার করে ও মূর্তি পূজারী, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে একজোট হয়। যে সব রাজাদেরকে রাসূল (দঃ) ইসলাম কবুলের দাওয়াত দেন, তাদের একজন হলো খসরু উপাধিধারী পারভেজ ইবনে হরমুজ।

আবদুল্লাহ ইবনে হুদহাফা দূত হিসাবে খসরুর কাছে যান। কিন্তু খসরু রাসূল (দঃ)-এর দাওয়াত ফিরিয়ে দেন ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেন। খসরু দু'জন দূত পাঠায় যেন মুসলমানরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। রাসূল (দঃ) ঐ দু'জন দূতকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এরপর তিনি দূতদের বলেন পরদিন তিনি তাদের প্রস্তাবের উত্তর দেবেন। (টীকা ৬৩)

পরদিন রাসূল (দঃ) দূতদের তাই জানান যা আল্লাহ'র কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন।

আল্লাহ খসরুকে নানা দুঃখ-কষ্টে ফেললেন তার ছেলে শিরেভিয়ার মাধ্যমে। ছেলে তার বাবাকে খুন করবে অমুক মাসে অমুক রাতে অমুক সময়ে। (ইমাম আত তাবারীর তফসীর)। রাসূল (দঃ) তাদেরকে আরো বলেন ইয়ামেনের প্রশাসক বাদহান (যে খসরুর পক্ষে বার্তাটি পাঠায়) তাকে বলতে যে ঃ আমার ধর্ম ও রাজত্ব খসরুর রাজ্য থেকেও অনেক বিশাল হবে। তাকে আমার পক্ষ থেকে বলো, ইসলামে প্রবেশ করো। আমি তোমাকে তোমার যা আছে সেটা থাকার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আর আমি তোমাকে ইয়ামেনবাসীর রাজা বানাবো (আত-তাবারী)।

দূতরা ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে বাদহানকে সব জানালো। পারসিয়ান প্রশাসক তখন বলে, বেশ, আমরা দেখবো এখন কী হয়। যদি সে যা বলেছে তা সত্যি হয়, তবে সে সত্যিই আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)। (আত তাবারী)

এরপর বাদহান দূতদের কাছে জানতে চায় তারা মুহাম্মাদ (দঃ) সম্পর্কে কী মনে করে ? দু'জন দূতই রাসূল (দঃ) কে দেখে দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছিল। তারা বললো ঃ "আমরা এরকম রাজকীয় ব্যক্তিত্ব অন্য কোন শাসকের মধ্যে দেখিনি।

তিনি পাহারাবিহীন অথচ নির্ভীক। মুহাম্মাদ (দঃ) নম্রভাবে মানুষের সাথে চলাফেরা করেন।"

বাদহান কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখার জন্য যে খসরু সম্পর্কে রাসূল (দঃ) যা বলেছেন তা সত্যি হয় কি না। যখন সে দেখলো সবই সত্য, তখন সে ঘোষণা দিল তার বিশ্বাস মুহাম্মাদ (দঃ) সত্যিই আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)।

হাদীস ও অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রে বলা হয়, বাদহান খসরুর ছেলের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিল– আমি খসরুকে খুন করেছি। যখন তুমি এই চিঠি পাবে তখন সবার কাছ থেকে আমার নামে আনুগত্যের শপথ নাও। খসরু আগে যা নির্দেশ দিয়েছিল সেগুলি কোনটাই এখন করবে না যতক্ষণ আমি নির্দেশ না পাঠাই। (আত তাবারী)

চিঠি পাওয়ার পর বাদহান ও তার সাথীরা হিসাব করে মিলিয়ে দেখলো রাসূল (দঃ) যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই সব কিছু হয়েছে। (টীকা ৬৪)

এই মুযেজার পর প্রথমে বাদহান ও পরে ইয়েমেনী আবনা ইসলাম কবুল করে। (টীকা ৬৫)

বাদহান হলো প্রথম গভর্নর যাকে রাসূল (দঃ) নিয়োগ দেন ও প্রথম পারসিয়ান গভর্নর যে মুসলমান হয়।

কিয়ামতের আলামত

অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বেশ কিছু বিষয়ের ভবিষ্যৎবাণী রাসূল (দঃ) করে যান। তাঁর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরে আমরা দেখছি অনেক কিছুই এখন ঘটছে।

আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীসের কথা বলি যা আমি রাসূল (দঃ)-এর কাছে শুনেছি আর আমার পরে আর কেউ এটা বলবে না। আমি রাসূল (দঃ)-কে বলতে শুনেছি- কিয়ামতের আলামত হলো জ্ঞান অদৃশ্য হবে ও অজ্ঞতার প্রসার হবে। ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে ; মদ খাওয়া সাধারণ ব্যপারে পরিণত হবে ; পুরুষের সংখ্যা কমবে ও নারীর সংখ্যা বাড়বে যতক্ষণ না অবস্থা এমন দাড়ায় যে এক পুরুষকে ৫০ মহিলার দেখাশোনা করতে হয়।

আবদুল্লাহ বলেন ঃ রাসূল (দঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের ঠিক আগে আগে এমন সময় আসবে যখন জ্ঞান থাকবে না আর অজ্ঞতা দেখা দিবে চারিদিকে ; খুন অনেক বেড়ে যাবে (ইবনে মাজাহ ; বুখারী ও মুসলিম হাদীস ; আল আমাসের হাদীস)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন ঃ রাসূল (দঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ হে মুহাজিরদের দল ; যদি পাঁচটি জিনিস তোমাদের মধ্যে দেখা দেয়, তবে নানাভাবে তোমরা শাস্তি পাবে। আমি আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যাতে তোমরা এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে পারো।

কোন দলের মধ্যে অশালীনতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা তারা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে ; তাহলে প্লেগ তাদের মধ্যে দেখা দেয় ; এমন অসুখ তাদের হয় যা তাদের আগেকার মানুষদের কখনো হয়নি। যদি তারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাহলে খরা ও ভয়াবহ দুঃখ দেখা দিবে ও স্বৈরশাসক তাদের উপর নেতৃত্ব করবে।

যদি তারা সম্পত্তির উপর যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তবে তারা বৃষ্টির রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। যদি জীবজন্তু না থাকতো তাহলে তারা একেবারেই বৃষ্টি পেত না।

যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ)-এর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে আল্লাহ বাইরের শত্রুদের মধ্যে থেকে কাউকে তাদের শাসক বানাবেন- যে তাদের যা আছে তা থেকে কিছু দখলে নেবে। শাসকরা যদি আল্লাহ'র দেয়া আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান মেনে না চলে ও নিজ ইচ্ছামতো চলে যার ভিত্তি কুরআনে নেই, তাহলে আল্লাহ তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেবেন (ইবনে মাজাহ)।

১০. উপসংহার

মুযেজা হলো অসাধারণ কিছু যা ঘটানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ'র তরফ থেকে ঘটে। মুযেজা যে শুধু হযরত মুসা (আঃ)-এর সমুদ্র ভাগ করা বা হযরত ঈসা (আঃ) এর অন্ধকে ভাল করে তোলার মতো দৃশ্যমান কোন ঘটনাই হবে- তা নয়। বিভিন্ন নবী ও রাসূল (দঃ)-কে আল্লাহ'র সমর্থন দান, বিপদের সময় আল্লাহ'র তরফ থেকে ওহী ও সাহায্য পাঠানো- এসবকে সাধারণভাবে যত ছোটই মনে হোক না কেন- এগুলিও মুযেজা।

হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) কে বিভিন্ন ধরনের মুযেজা দান করা হয়- যা তাঁর জীবনের সব ক্ষেত্রে ছাপ ফেলেছে। রাসূল (দঃ)-কে দান করা হয় ব্যতিক্রমধর্মী এক মুযেজা – বায়তুল মুকাদ্দাসে রাত্রিবেলা সফর ও সাত আকাশে ভ্রমণ। এই মুযেজা কেউ চোখে দেখেনি, তবে বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে প্রমাণিত যা বিশ্বাস করতে মানুষ বাধ্য হয়।

রাসূল (দঃ) কে কিছু দৃশ্যমান মুযেজা দান করা হয় যেমন আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া- যা সেই সময়ে বহু লোকজন দেখেছে। এছাড়া, রাসূল (দঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়।

আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর রাসূল (দঃ) কে নানাভাবে সাহায্য করেন। এক কথায়, রাসূল (দঃ)-এর জীবন ও চরিত্র, কথা ও প্রার্থনা – সব কিছুই ছিল অনন্য ও রহমতে ভরপুর। রাসূল (দঃ) এর জীবনের মুযেজাগুলি যেমন ছিল বিচিত্র রকমের, সেগুলি ঘটার কারণও ছিল বিভিন্ন। কিছু মুযেজা ঘটে মুসলমানদের দৃঢ় রাখা ও তাদেরকে অধ্যাত্মিক ও শারীরিক দু'ভাবেই শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দেয়ার জন্য। এর একটি উদাহরণ হলো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ'র তরফের সাহায্য। কিছু মুযেজা ঘটে শত্রুর হাত থেকে রাসূল (দঃ)-কে বাঁচানোর জন্য।

এটি ঘটে ওহীর মাধ্যমে কাফিরদের ষড়যন্ত্র রাসূল (দঃ)-এর কাছে জানানো থেকে শুরু করে দৃশ্যমান সাহায্য যেমন গুহায় মাকড়সার জাল বোনার মাধ্যমে- যখন রাসূল (দঃ) সাথীসহ কাফিরদের থেকে পালিয়ে ছিলেন। অন্য কিছু মুযেজা ঘটে এটা প্রমাণ করতে যে মুহাম্মাদ (দঃ) সত্যবাদী। তাই তিনি যা বলছেন তাঁর সমর্থনে কিছু মুযেজা ঘটানো হয় যেমন গাছ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ এক ও মুহাম্মাদ (দঃ) আল্লাহ'র রাসূল (দঃ)।

অনেক সময় মানুষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুযেজা দান করা হয়। মক্কার লোকেরা রাসূল (দঃ) কে মুযেজা দেখাতে বললে আল্লাহ'র আদেশে রাসূল (দঃ)-এর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দুই টুকরো হয়। মুযেজার কারণে কিছু মানুষ সত্য পথে আসে, কিছু মানুষ রয়ে যায় কঠিন মন নিয়ে। তারা আল্লাহ'র এসব নিদর্শনকে জাদুবিদ্যা বলে। এটা আল্লাহ'র ইচ্ছা যে তিনি চাইলে এমন মুযেজা দেখানো যেতো যাতে সবাই বিশ্বাস আনে।

"আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে এমন এক নির্দশন পাঠাতে পারতাম, যার সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যেতো। *[সূরা আস-শু'আরা ; ২৬ ঃ ৪]*

কিন্তু তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে যে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন- সেটা তার বিরোধী হতো। কেননা, আল্লাহ'র দেয়া জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে আমরা বিচার করি কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। মুযেজা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও কাফিরদের মধ্যেকার পার্থক্যকে প্রকাশ করে দেয়- কে স্রষ্টায় বিশ্বাসী আর কে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী- মুযেজার মাধ্যমে তার প্রমাণ হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন বিশ্বাসীরা কিভাবে উত্তর দিয়েছিল ঃ

"আপনি মহান পবিত্র ; আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার বেশি আমরা কিছুই জানি না। আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" *[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ৩২]*

– এবং যারা প্রত্যাখ্যান করে ঃ

"তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে, তখন তাচ্ছিল্য করে হাসে। বলে ঃ এতো শুধু এক জাদু"।

[সূরা সাফফাত ; ৩৭ ঃ ১৪-১৫]

সব নবী রাসূলকে দেয়া মুযেজাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-কে দান করা মুযেজা একটি বিশেষ বিবেচনায় আলাদা- রাসূল (দঃ) এর মুযেজা অনেক বেশি মানুষ দেখেছে।

মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এর মুযেজাগুলি শুধুমাত্র তাঁদের সময়ের মানুষ দেখেছে। কিন্তু রাসূল (দঃ) যে মুযেজাগুলি লাভ করেছিলেন, সেগুলি এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও মানুষ দেখেছে। যেমন সাহাবীদের শহীদ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ও কিছু এলাকায় বিজয় লাভ। অবশ্য সবচেয়ে স্থায়ী মুযেজা হলো- যা লক্ষ কোটি মানুষ সারা দুনিয়ায় যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছে- তাহলো পবিত্র কুরআন। নানা দিক থেকেই কুরআন অলৌকিক – যেভাবে এটা নাজিল হয়েছে, যেভাবে এটা সংকলিত হয়েছে ও যেভাবে এটা সংরক্ষিত হয়েছে- সবই অসাধারণ।

রাসূল (দঃ) আমাদের জন্য অলৌকিক কুরআন রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই- যেভাবে এটা তাঁর কাছে নাজিল হয়েছিল। আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন ; একজন তাই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এই মুযেজা পাঠ করবে ও কুরআনের আদর্শকে গ্রহণ করবে অথবা ত্যাগ করে এই মুযেজাকে অস্বীকার করবে।

"যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে তা তেলাওয়াত করে, তারাই কুরআনে বিশ্বাস আনে। যারা অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

[সূরা বাকারা ; ২ ঃ ১২১]

"তারা (ফিরিশতারা) বলে ঃ আপনি মহান পবিত্র ; আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার বেশী আমরা কিছুই জানি না। আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

[পবিত্র কুরআন, সূরা বাকারা ; ২ ঃ ৩২]

টীকা

1. As-Suyuti, Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas], Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 298
2. Ibid., p. 300
3. 'Mu'allaqat' : http://www.britannica.com/eb/article-9054111
4. Ahmet Cevdet Pasa, Muallim Mahir iz, Peygamber Efendimiz (sav) (Our Prophet [saas], Izmir, Isik Publications, 1996, pp. 55-56
5. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Collection, "The Letters : The Nineteenth Letter, Eighteenth Sign, Second Remark", http:/www.risaleinur.com.tr/rnk/eng/letters/19letters. html
6. See Perished Nations, Harun Yahya, Ta-Ha Publishers Ltd., 2002
7. Bediuzzaman Said Nursi, Risale- Nur Collection, "The Letters : The Twenty-sixth Letter, The First Topic, http:/www. risale-inur.com.tr/rnk//eng/words/15th word.htm
8. As-Suyuti, Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas], Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 237
9. Ibid., p. 238
10. Ibid., p. 237
11. Ibid., p. 286
12. Imam al-Ghazali, Ihya Ulum-ud-din (Revival of the Sciences of the Deen), trans, by Sitki Gulle, Huzur Publishings, Istanbul, 1998, pp. 795-796
13. Imam al-Ghazali, Ihya 'ulum ad-din (Revival of the Sciences of the Deen), vol. II, English Translation by Fazlul Karim, Islamic Book Services, New Delhi, 2001, p. 252
14. Afzalur Rahman, Encyclopaedia of Seerah: Muhammad (saas), Inkilap Publishing, Istanbul, 1996, p. 162
15. Imam Sa'id Hawa, al-Asas fi't-Tafsir (The Basics of Qur'anic Commentary), Samil Yayinevi, Istanbul, 1991, p. 332
16. Omer Nasuhi Bilmen, Ku'ran-i Kerim'in Turkce Meali (Tafsir of the Qur'an), vol. 2, Bilmen Basim ve Yayinevi, Istanbul, pp. 1101-1102

17. Ibn Kathir, Tafsir of Qur'an with Hadiths, vol. 9, Istanbul, Cagri Publications, 1996, p. 4623
18. Ibid., p. 4615
19. Ilyas Celebi, Itikadi Acidan Uzak ve Yakin Gelecekle Ilgili Haberler (Faith-Related Prophecies for the Far and Near Future), Istanbul, 1996, p. 161
20. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Collection, "The Letters: The Nineteenth Letter, Seventeenth Sign", http://www.risale-inur.com.tr/rnk/eng/letters/ 19letter.html
21. Ibid., http://www.risale-inur.com.tr/rnk/eng/letters/ 19letters.html
22. Qadi 'Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad Messenger of Allah Ash-Shifa, trans. Bewley, Madinah Press Inverness, Scotland, 3rd print, 1999, p. 165
23. Ibid., p. 167
24. Ibid., p. 168
25. Ibid., p. 158
26. Ibid., pp. 158-159
27. As-Suyuti, Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas], Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 536
28. As-Suyuti, Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 535
29. Qadi 'Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad Messenger of Allah Ash-Shifa, p. 161
30. Ibid., pp. 163-164
31. Ibid., p. 162
32. Ibid., p. 162
33. Ibn Kathir, The Virtues and Noble Character of the Prophet Muhammad (saas), Istanbul, Celik Yayinevi, 1982, p. 325
34. Ibid., pp. 316, 327
35. As-Suyuti, Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, 2003, p. 851
36. Ibid., p. 854
37. Ibid., p. 856

38. Afzalur Rahman, Encyclopaedia of Seerah: Muhammad (saas), Vol. III, Inkilap Publishing, Istanbul, 1996, p. 104
39. Shaykha Anne Khadeijah Darwish and Shaykh Ahmad Darwish, The Millennium Biography of Muhammad (saas) The Prophet of Allah, www.Allah.com
40. According to documents from Islamic and historical sources the Prophet left his home in the 14th year after becoming a prophet on the 27th day of the month of Safar (the second Arabic lunar month)
41. Omer Nasuhi Bilmen, Ku'ran-i Kerim'in Turkce Meali (Tafsir of the Qur'an), vol. 3, Bilmen Basim ve Yayinevi, Istanbul, p. 1270
42. Tafsir Ibn Kathir, abridged by Sheikh Muhammad Nasib Ar-Rafa'i Al-Firdous Ltd., London: 2002, pp. 145-146; hadith from Musnad Ahmad, Sahih al-Bukhari: 3653 and Sahih Muslim: 2381
43. As-Suyuti, Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 316
44. Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Adhim, Cagri Yayinlari, Istanbul, 1991, p. 3318
45. Omer Nasuhi Bilmen, Ku'ran-i Kerim'in Turkce Meali Alisi ve Tefsiri (Tafsir of the Noble Qur'an), vol. 1, Bilmen Publishings, Istanbul, p. 451
46. Ibn Kathir, Tafsir of Qur'an with Hadiths, vol. 7, Istanbul, Cagri Publications, 1993, p. 3447
47. Sa'id Hawa, al-Asas fi't-tafsir (The Basics of Qur'anic Commentary), Samil Yayinevi, Istanbul: 1991, vol. 2, p. 444
48. As-Suyuti. Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, pp. 688-689
49. Ibid., p. 690
50. Ibid., p. 1115
51. Ibid., p. 1120
52. Ibid., p. 1120
53. Ibid., p. 1120
54. Ibid., p. 1121
55. "Heraclius;" http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius
56. "Heraclius 610-641;" http://fstav. freeservers.com/ emperos/heraclius.html

57. Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford, California, Stanford University Press, 1997, pp/ 287-299

58. http://web.genie.it/utenti/i/inanna/livello2-i/mediterraneo-1-i.htm; http:/impearls.blogspot.com/2003_12_07_impearls_archive.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius

59. Tafsir al-Jalalayn, Faith Enes Publishing, Istanbul, 1997, vol. III, p. 1843

60. The people of knowledge say that the qirat is a sub-division of a dinar or a dirham

61. "The Arab Conquest of Egypt," http:/www.nationmaster.com/encyclopedia/ History-of-early-Arab-Egypt

62. "Fatih" means literally "Opener", just as "fath" means "opening", i.e. the opening to Islam.

63. "Chosroes II, Siroes, and Prophet Muhammad (628 CE):" http://www.cyberistan.org/islamic/chosroes.html

64. Salih Suruc, Kainatin Efendisi Peygamberimizin Hayati (The Life of the Prophet [saas]), Yeni Asya Publications, Istanbul, 1998, p. 225

65. "Chosroes II, Siroes, and Prophet Muhammad (628 CE):" http://www.cyberistan.org/islamic/chosroes.html

66. Salih Suruc, Kainatin Efendisi Peygamberimizin Hayati (The Life of the Prophet [saas]), Yeni Asya Publications, Istanbul, 1998, p. 225

রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর মুযেজা

মানুষ যেন এই দুনিয়ায় ও মৃত্যুর পরের জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ যুগে যুগে সব জাতির কাছে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। কিছু রাসূলকে মুযেজা প্রদর্শনের শক্তি দান করা হয় যেন আল্লাহর বাণী প্রচারে তা তাঁদেরকে সাহায্য করে।

মুযেজাপ্রাপ্ত নবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন– হযরত ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (স)। এসব মুযেজার কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। আগের অনেক নবী ও রাসূলদের মতো হযরত মুহাম্মাদ (স) ও আল্লাহর অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু মুযেজা দেখান– যেন মানুষ মুযেজা থেকে শিখতে পারে। কিছু মুযেজা বিখ্যাত যেমন পবিত্র মসজিদে রাত্রিকালীন ভ্রমণ ও আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য সাত আসমানে গমণ। অন্য কিছু মুযেজা ততটা পরিচিত নয় যেমন– রাসূলের আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া।

হারুন ইয়াহিয়ার এই বইতে মুযেজার প্রকৃতি, কেন ও কখন বিভিন্ন নবীকে আল্লাহ মুযেজা দান করেন, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়া, কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কে যে সব মুযেজা দেখানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।